স্মৃতিরঙ্গ

প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়

স্মৃতিরঙ্গ

স্মৃতিরঙ্গ

[illegible] চট্টোপাধ্যায়

নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রকাশক শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ বসু
নাভানা
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

প্রচ্ছদচিত্র শ্রীরণেন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অঙ্কিত

প্রথম মুদ্রণ
পৌষ ১৩৬১, জানুয়ারি ১৯৫৫

দাম : আড়াই টাকা

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলকাতা ১৩

মানুষের জীবনে ঘটনাগুলো ঘটে অত্যন্ত এলোমেলোভাবে। তাদের জোড়াতাড়া দিয়ে গুছিয়ে-গাছিয়ে ভদ্রসমাজে প্রকাশ করতে গেলে একটা যোগসূত্র আপনা-হ'তে দরকার হ'য়ে পড়ে। এই যোগসূত্র মূলে বাস্তব হ'লেও এর ডাল-পালায় কিছু-না-কিছু অবাস্তবের ছোঁয়া লেগেই থাকে। তাইতেই এ-ক্ষেত্রে কাল ঠিক ঘড়ির কাঁটা ধ'রে চলে না, স্থান অনায়াসেই ম্যাপকে ডিঙিয়ে যায়, আর পাত্রপাত্রী কেউই ফোটোগ্রাফে ধরা নিখুঁত ছবি হ'য়ে ওঠে না। আসলে মানুষের জীবনও তো অনেকটা ওমনিধারা। তার কিছুটা বিধাতা গ'ড়ে ছেড়ে দেন, খানিকটা মানুষ নিজেই গড়ে, বাকি সবটাই অপরে গ'ড়ে দেয়।

খানকয়েক পুরনো চিঠি, গোটাকয়েক রংছুট ছবি, ডায়েরিতে টুকে-রাখা কতক টুকরো-টুকরো খাপছাড়া কথা, কিছু উপহারদ্রব্য— এই উপকরণের সাহায্যে প্রবাসকালের প্রায় মুছে যেতে বসা স্মৃতি থেকে এই স্কেচ্‌গুলি উদ্ধার করা। মুশকিল এই যে, স্কেচ্‌ সর্বদাই একপেশে ছবি হয়, এতে পুরো চেহারাটা ধরাবার মতো জায়গা পাওয়া যায় না। স্কেচ্‌গুলি ইতিপূর্বে দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকায় ছাপা হয়েছিলো। এখন এই বই-এ তাদের একত্র সংগ্রহ করা গেলো।

প্রিয়বর শ্রীযুক্ত বিরাম মুখোপাধ্যায় বইটির নামকরণ ক'রে দিয়ে আমায় কৃতার্থ করেছেন।

অগ্রহায়ণ, ১৩৬১ গ্রন্থকার

ম্যানহাটান

উনিশ নম্বর ডি-ভিয়র গার্ডেন্স-এর যে-ফ্ল্যাটে আমি থাকতুম, তার কর্ত্রী ছিলেন মিসেস ফ্লেচর। ছোটোখাটো একরত্তি বিধবা মানুষ। বেশ প্রাচীন হয়েছেন, তবু তখনো সাজবার-গোজবার ষোলো আনা ছেড়ে, আঠারো আনা শখ। হপ্তার ছ'দিন তিনি নিজের বেড্রুমে শুয়ে-ব'সে দিন কাটান। রবিবার বিকেলে সেজেগুজে ফিটফাট হ'য়ে নিজের গুহা ছেড়ে বেরোন। দৌড় কিন্তু ওই ড্রয়িং রুম পর্যন্ত।

তখন আর তাঁকে চেনবার জো নেই। মাথায় অবরন্ রং-এর পরচুলো। গালে গোলাপী রুজের আভা। ঘন লাল রং-এর লিপ্স্টিক দিয়ে পুরু ক'রে ঠোঁট রাঙানো তখনো ঠিক ফ্যাশন হয় নি। নখে রং পালিশ করাটাও সে-সময় জানা ছিলো না। তবে মিসেস ফ্লেচরের গলায় আসল মুক্তোর মালা, আঙুলে দামী পাথরের আংটি। একেবারে জবড়জঙ সজ্জা না হ'লেও বেশ ছেলেমানুষি সাজ। ভালো ক'রে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইয়োরোপীয়ন মেয়েরা সহজে স্বাভাবিকভাবে বুড়ি হ'তে পারেন না। সেই কারণে আমাদের দেশের বৃদ্ধাদের মতন শান্ত গম্ভীর ভাব তাঁদের মধ্যে নেই। তাই শ্রদ্ধাস্পদ হওয়ার চেয়ে তাঁরা হাস্যাস্পদ হন ঢের বেশি। পদে-পদে।

ফ্ল্যাটের ড্রয়িং রুমে মিসেস ফ্লেচরের দরবার বসতো। আত্মীয়-বন্ধু সকলেই জানতেন, রবিবার সাড়ে চারটে থেকে সাড়ে ছ'টা পর্যন্ত মিসেস ফ্লেচর অ্যাট-হোম। অর্থাৎ, ওইদিন ওই-সময়ের মধ্যে আগের থেকে খবর না দিয়েও যে-কেউ এসে মিসেস ফ্লেচরের দর্শন পেতেন।

আর তার সঙ্গে পেতেন এক কি ছু-পেয়ালা চা, পাতলা কাগজের মতন কাটা মাখন লাগানো ছু-স্লাইস ফিনফিনে ব্রাউন রুটি, আর কড়ে-আঙুলপ্রমাণ ছোট্টো একটুখানি কেক্।

মিসেস ফ্লেচরের এক-সময়ে সোসাইটিতে খুবই আনাগোনা ছিলো। সেই সূত্রে অনেকেই রবিবারে আমাদের ফ্ল্যাটে দেখা দিতেন। এক প্রকাণ্ড গোল টেবিলের মাঝখানে ব'সে মিসেস ফ্লেচর যখন তাঁর অতিথিদের জন্যে চা ঢালতেন তখন বোধ হয় তাঁর মনে হ'তো, তিনি মরেন নি ; জীবিতই আছেন। সব দেখে-শুনে আমার মনে হ'তো, মরা হাতিরও লাখ টাকা দাম।

রবিবারের দরবারে প্রত্যেক হপ্তায় ছুটি মেয়ে নিয়মিত আসতো। বয়েসে উনিশ-কুড়ি বছরের বেশি নয় ছুই বোন— অলিভ আর আইভি। মিসেস ফ্লেচরের কিরকম যেন আত্মীয়। তাঁরা পরস্পরকে কাসিন্ বলতেন। কিন্তু বিলিতি কাসিন্ শব্দটি ঠিক যে কোন সম্পর্ককে বোঝায়, তা আমি এখনো ভালো ক'রে বুঝে উঠতে পারি নি। সামান্য একটু দূর-সম্পর্কের খুড়ো মামাকেও ইংরেজদের কাসিন্ আখ্যা দিতে শুনেছি।

সম্পর্কটা যাই হোক, অলিভ ও আইভি মেয়ে ছুটি বেশ সভ্যভব্য। লেখাপড়া-জানা কাণ্ডজ্ঞানওয়ালা ধীরস্থির মেয়ে। ঠোঁটে-মুখে রং মাখে না, বুঝে-সমঝে সামান্য একটু-আধটু পাউডার লাগায় মাত্র। কথায়-কথায় সিগরেট ফোঁকে না। রাজার উপর পরম ভক্তি, খ্রীস্টানধর্মের উপর দৃঢ় বিশ্বাস, পলিটিক্সে দারুণ কন্‌সারভেটিভ্।

এদের চোখ বুঁজে বিশ্বাস করা যায়। আর বিশ্বাস করলে কখনো ঠকতে হয় না। আত্মসম্মানজ্ঞান এদের এতোই টনটনে। অর্থাৎ, বিলিতি আপার মিড্‌ল ক্লাসের মেয়েরা যেমনটা হয়, এ-ছুটি ঠিক তাই।

এ-সব মেয়েরা এখন যে কি রূপ ধারণ করেছে তা অবশ্য আমার জানা নেই।

মেয়ে দুটোর মা অনেক আগেই মারা গেছেন। বাপও এই কিছুদিন আগে প্রথম মহাযুদ্ধের যুদ্ধক্ষেত্রেই গোলা খেয়ে প্রাণত্যাগ করেছেন। অবস্থা তাই পড়তির দিকে। মেয়ে দুটো বিপদে প'ড়ে মাথায় হাত দিয়ে ব'সে না থেকে কিছু উপায় ক'রে আয় বাড়াতে চায়।

অলিভ আর আইভি আমাকে আংকল্ টপো (আমার পিতৃদত্ত নামের বিলিতি অপভ্রংশ) ব'লে ডাকতো। বয়েসে খুব প্রাচীন না হ'লেও তখন থেকেই আমার চেহারাটা বেশ ভারিক্কে-গোছের। বেশি কথা না ক'য়ে মান বাঁচাতুম। ক্বচিৎ-কদাচিৎ মুখ খুললে যে দু-চারটে বুকনি ঝাড়তুম, তা থেকে সবাই একরকম ধ'রে নিয়েছিলো, আমি নিশ্চয়ই ওয়াইস্ মেন্ অভ্ দ' ঈষ্ট্‌দেরই একজন।

একদিন দুই বোন তাদের মনের কথাটা আমায় খুলে বললে। বাপ যা রেখে যেতে পেরেছিলেন তার আয়ে আর ভদ্রভাবে দিন চলে না। যুদ্ধের পর যা মাগ্‌গিগণ্ডার বাজার পড়েছে। শিগ্‌গিরই একটা-কিছু বিহিত করা চাই।

সব শুনে আমি একটু মুরুব্বিয়ানা চালে বললুম, 'তোমরা কি জানো আর না-জানো তা তো আমার জানা নেই। তবে একটা জিনিস বলতে পারি। আমাদের পাড়ার কাছাকাছি কোথাও একটিও খাবার জায়গা নেই। রোজই দেখি, সামনের কেনসিংটন গার্ডেন্সে বুড়ো-বুড়িরা রুটিন বেঁধে হাওয়া খেতে আসে। অনেক নিষ্কর্মা বড়োলোকের ছেলেমেয়েরাও ওখানে ঘুরে বেড়ায়। কাছাকাছি একটা রেস্তোরাঁ খুললে মন্দ চলবে না। ভালো লাঞ্চ চা পেলে ওরা আসবে না কেন? লাঞ্চ যতোটা না হোক, চা খেতে তো আসবেই। তোমাদের ইংরেজদের,

বিশেষত ইংরেজ মেয়েদের— লাঞ্চ না হ'লে তবু দিন চ'লে যায়; কিন্তু ঠিক সময় এক পেয়ালা চা না পেলে তো তাঁরা হন্যে কুকুর হ'য়ে ওঠেন।'

কথাটা দু-জনারই মনে লাগলো। অলিভ বললে, 'আমি বেশ রাঁধতে জানি। ইস্কুলে শখ ক'রে রান্না শিখেছিলুম। পরে, রান্নার ইস্কুলে ট্রেনিং নিয়ে হাত পাকিয়েছি। কিছুটা ড্রয়িং-পেন্টিংও শিখেছিলুম; কিন্তু সেটা আর কোনো কাজে লাগলো না।' আইভি বললে, 'ইস্কুলে থাকতে আমি কিছুটা পিয়ানো, কিছুটা বেহালা বাজাতে শিখেছিলুম। পরে, মিউজিক স্কুলে ভর্তি হ'য়ে ও-সবের চর্চাও রেখেছিলুম। কিন্তু এখন সে-সব কোনো কাজে লাগছে না। এখন মার্চেন্ট-হাউসে ঢুকবো ব'লে ভালো ক'রে বুক-কিপিংটা শিখছি। ডিপ্লোমা পাবার সময় হয়েছে।' আমি বললুম, 'তা হ'লে লেগে যাও। ওই বিদ্যে নিয়েই তোমরা ইটিং-হাউস বেশ ভালোই চালাতে পারবে।'

দুই বোনে খুশি হ'য়ে উঠে আমার দু-হাত দু-জনে দু-দিক থেকে ধরলো। বললো, 'আংকল্, তুমি আশীর্বাদ করো আমাদের ব্যবসা যেন ভালো চলে।' আমি ইংরিজিতে কিছু বললুম না। দুই বোনের মাথার উপর দু-হাত রেখে বাংলাতেই বললুম, 'তথাস্তু।'

পরদিনই ওদের সঙ্গে ঘর খুঁজতে বেরুলাম। ওদের আর তর সয় না। কেনসিংটন পাড়ায় ঘরের দাম অসম্ভব। অলিভ-আইভির পুঁজি অল্প। তারা অতো ভাড়ায় ঘর নিতে রাজী হ'লো না। আমি আশ্বাস দিলুম, 'ব্যস্ত হ'য়ো না, আমি শিগ্‌গিরই একটা-কিছু খুঁজে বের করছি।' বেরও করলুম। কেনসিংটন হাই স্ট্রীটের উপরেই একটা প্রকাণ্ড বাড়ির মাটির নিচে বেসমেণ্টে ঘরজোড়া এক প্রকাণ্ড কোল্-সেলার। এককালে ওটা বাড়িওয়ালার সংবৎসরের কয়লা মজুত রাখবার গুদম ছিলো। এখন বাড়ি-বাড়ি গ্যাস-ইলেকট্রিসিটি বসায়

সেলারটি খালি প'ড়ে আছে। যতো রাজ্যের টুটোফুটো বাক্স-তোরঙ্গ আসবাবপত্তর কাঠ-কাটরা পুরনো খবরের কাগজে ভর্তি। ইঁদুর আর আরশোলার রাজত্ব।

অলিভ-আইভি দু-জনে একসঙ্গে চিৎকার ক'রে উঠলো, 'আংকল্, এটা নিয়ে কি হবে?' আমি বললুম, 'রোসো, দেখাচ্ছি কি হবে।' —ব'লে, বাড়িওয়ালার কাছে গিয়ে তিন মাসের ভাড়া অগ্রিম দিয়ে অলিভদের নামে কোল্-সেলারটা বুক্ ক'রে ফেললুম। ওটা তো এমনিই প'ড়ে ছিলো। বেশি ভাড়া লাগলো না। হপ্তা-হপ্তা আধ-গিনি দিতে হবে, স্থির হ'লো। পরদিনই বাড়িওয়ালা ভাঙাচোরা লটবহর সরিয়ে ফেলে ঘরটাকে সাফ্-সুতরো ক'রে দিলো। ইলেকট্রিকের লাইন আগের থেকেই বসানো ছিলো। গুটিকয়েক হাই পাওয়ারের বালব্ এনে লাগাতেই অন্ধকার ঘরে দিনের আলো মালুম দিতে লাগলো।

আমি অলিভকে ডেকে বল্লুম, 'তুমি না বলেছিলে, আঁকাজোঁকার একটু হাত আছে তোমার? এইবার তা হ'লে দেয়ালের গায়ে হাত লাগাও। কি রং মানাবে না-মানাবে, সে ভার তোমার। ডিসাইন্ সাপ্লাই করবো আমি।'

এইখানে ব'লে রাখি, আমি বিদ্যে ফলাবার জন্যে মাঝে-মাঝে আর্টের দু-একখানা বই কিনে এনে পড়ি। যারা একসঙ্গে দু-লাইন সোজা টান টানতে পারে না, তারাই নিজেদের মনে করে বড়োদরের আর্ট-ক্রিটিক। এটা আমার জানা ছিলো। আমিও নামজাদা ক'খানা বইপত্তর ঘেঁটে কপ্চাবার মতন আর্টের অনেকগুলো বাঁধি গৎ রপ্ত ক'রে ফেলেছিলুম।

অনেক রাবিশ আর্টের বই-এর মধ্যে একটা ভালো ইণ্ডিয়ান আর্টের বই আমার কাছে ছিলো। সত্যি ভালো বই। কেননা, এতে ছবি বেশি,

লেটার-প্রেস অতি কম। বইটার থেকে গোটা দু-তিন ডিসাইন্ বেছে নিয়ে অলিভের মুখের সামনে ধরতে সে তো লাফিয়ে নেচে উঠলো। বললো, 'আংকল্, তোমার অনেক বিদ্যে আছে দেখছি।' আমি রহস্য ক'রে বললুম, 'তা আছে বৈকি? দেখবে এখন, এর পর আরো অনেক-কিছু দেখবে। আমি মাসিকপত্রের সিরিয়ল নভেলের মতন ক্রমশ প্রকাশ্য।'

যা-ই হোক, অলিভ বড়ো মিথ্যে বলে নি। এক সপ্তাহের মধ্যে তার হাতের গুণে বেসমেণ্টের সেই কোল্-সেলার এক অপরূপ মূর্তি ধারণ করলো। চেনা দায়। তারপর ঘর সাজানো। পূর্বেই বলেছি, বাড়িওয়ালার অনেক দিন ধ'রে জমানো বেশ-কিছু পুরনো কাঠ-কাটরা জড়ো হ'য়ে প'ড়ে ছিলো। সেগুলো সস্তা দরে কিনে ফেলা গেলো। তার থেকে কাঠ চিরে বের ক'রে ও-দেশের আর আমাদের দেশের দু-রকম স্টাইল মিশিয়ে নিচু-নিচু কিন্তু বেশ আরামের, কতকগুলো টেবিল চেয়ার তৈরি করানো গেলো।

ঘরের এককোণ একেবারে নতুনরকমে সাজানো হ'লো। সেখানে টেবিল চেয়ার কিছু নেই। একটা আধা-ডিভান আধা-তক্তাপোশ সেখানে পাতা হ'লো। তার উপর বিছোবার জন্যে মিসেস ফ্লেচরের পুরনো নরম তুলতুলে এক অতি মনোহর পারসিয়ান কার্পেট জলের দরে পাওয়া গেলো। মিসেস ফ্লেচর ওমনিই দিতে রাজী ছিলেন; কিন্তু অলিভ-আইভির এমনই শিক্ষা যে, তারা পারতপক্ষে কোনো জিনিস কারুর কাছ থেকে এমনি নেবে না। তক্তার উপর পড়লো আমাদের দিশি প্রথায় ছোটো-ছোটো সিল্কের তাকিয়া।

পেয়ালা-পিরিচ প্লেট অ্যাশট্রে ফুলদানি সবই অলিভ রাত জেগে নিজের হাতে পেণ্ট ক'রে ফেললে।

সব ভালো ক'রে দেখে-শুনে নিয়ে আমি বললুম, 'এবার তোমাদের

ড্রেস্। তোমাদের ওই দারুণ আঁটসাঁট বিলিতি ফ্রক্ এ-সব সাজসজ্জার সঙ্গে কিছুতেই মানাবে না। তোমরা ভিতরে যা-ই পরো না কেন, তাতে আমি কিছুমাত্র আপত্তি করবো না। কিন্তু তোমাদের উপরকার ড্রেস্‌টা হবে সেকালের গ্রীক মেয়েদের আলখাল্লার মতন। পায়ে থাকবে মোজা-ছাড়া গ্রীক স্যাণ্ডল্।' সত্যি বলতে গেলে, আইডিয়াটা আমার নিজের নয়, একেবারে চুরিবিদ্যে। প্যারিসে ইসোডোরা ডান্‌কানের স্টুডিওতে নাচশিক্ষার্থী মেয়েদের ওইরকম ড্রেস্ দেখেছিলুম।

অলিভ-আইভির পরবার জন্যে ঘরের রং-এর সঙ্গে ম্যাচ করা আলখাল্লা এলো। তার সঙ্গে মানানসই কোমরবন্ধ। সেই রং-এরই মাথার রিবন। পায়ে দেবার জন্যে স্ট্র্যাপ-বাঁধা হিল্-ছুট স্যাণ্ডল্।

এইবার রেস্তোরাঁর একটা নাম দিতে হয়। আমি বললুম, 'ইংরিজি ভাষায় আমার এমন-কিছু দখল নেই যে, তার বলে ইংরেজদের কাছে কোন নামটা বেশ মনটানা-গোছের হবে, সে-রকম একটা নাম খুঁজে বের করি। তোমরাই যা-হোক একটা-কিছু স্থির ক'রে ফেলো।' অলিভ-আইভি অনেক ভেবে-চিন্তে একটা অ্যামেরিকান নাম পছন্দ করলো। দোকানের নাম দিলো— ম্যানহাটান।

সব তো একরকম হ'লো। এদিকে উৎসাহের চোটে খরচ করতে-করতে অলিভ বেচারীদের পুঁজি বেশ খানিকটা ফাঁক হ'য়ে গেলো। এখন দোকান ভালো ক'রে না চললে বিষম বিপদ। আমাকে মুষড়ে যেতে দেখে দুই বোনে আদর ক'রে বললে, 'আংক্‌ল্, তুমি ঘাবড়িয়ো না। দেখবে, শেষে সব ঠিক হ'য়ে যাবে। বিধাতার আশীর্বাদে আমরা নিশ্চয়ই সাকসেসফুল হবো।' কী সাহস ওই দুই মেয়ের ছোটো দুটো বুকের মধ্যে! আমি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করলুম মেয়ে দুটো যাতে জয়যুক্ত হয়।

ম্যানহাটান খোলবার দিনস্থির হ'য়ে গেলো। ঠিক হ'লো, প্রথম

বলছেন, তাই চ'ড়ে শোভাযাত্রা করলে তাঁর ডেসীকে অতি খুবসুরত দেখাবে ব'লে তাঁর বিশ্বাস, ইত্যাদি ইত্যাদি।

১৯২০ সালের জুন মাস। তখন আমি এক-হিড়িকে তিন-তিনটে প্রিলিম্‌নারী বার্‌-এগ্‌জামিন কোনোরকমে একসঙ্গে থার্ড ক্লাশে পাস ক'রে ব'সে আছি। ফাইনাল এগ্‌জামিন অনেক দূরে। যখন ইচ্ছে তখন তৈরি হ'য়ে নিয়ে পরীক্ষা দেওয়া চলবে। হাতে কাজ নেই। তাই খেয়াল হ'লো, উপনিষদের বাছাই-বাছাই শ্লোকগুলো ইংরিজিতে তর্জমা করি। বেশ! কিন্তু বেশ বললে কি হয়? উপনিষদের শ্লোকগুলোর মানে ওরই মধ্যে তবু একটু বোঝা যায়, কিন্তু তাদের শাঙ্করভাষ্য পড়তে গিয়ে মাথার ঘিলু ছিটকে বেরিয়ে আসে। এক লাইনের বেশি এগুনো যায় না। পুঁথি বন্ধ ক'রে জন্‌-এর স্টলে আড্ডা দিতে ছুটতে হয়।

এমনি চলছে, এমন সময় উইলি পিয়ার্সন এসে খবর দিলেন, গুরুদেব লণ্ডনে আসছেন। শেষে একদিন গুরুদেব সত্যিই এসে পড়লেন। এসে, আমাদেরই বাড়ির কাছে কেনসিংটন প্যালেস ম্যানসনে উঠলেন। কাছে ব'লে কাছে! আমার ওখান থেকে একলাফে সেখানে পৌঁছনো যায়। আমাদেরই ডি-ভিয়র্‌ গার্ডেন্স রাস্তার ঠিক মোড়ের উপর।

রোটেনস্টাইন গুরুদেবের জন্যে ওই জায়গাটা ঠিক ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর বাড়ির থেকে কাছে হবে ব'লে। রোটেনস্টাইন তখন নিকটেই নটিং হিল গেটে শেফিল্ড টেরাস ব'লে একটা রাস্তায় বাস করেন। সেখান থেকে তিনি একদিন কেনসিংটনে গুরুদেবের কাছে আসতেন, একদিন গুরুদেব নটিং হিল গেটে রোটেনস্টাইনের বাড়ি যেতেন।

একদিন কঠোপনিষদের বাকি অংশটার শাঙ্করভাষ্য শেষ করতেই হবে ব'লে পণ ক'রে ব'সে পড়তে-পড়তে রাত্তির বারোটা বেজে গেলো। আর না। বই রেখে উঠে পড়লুম। চললুম জন্‌-এর স্টলের দিকেই।

আনমনা হ'য়ে ডি-ভিয়র্ গার্ডেন্স-এর মাঝ রাস্তা দিয়েই হাঁটছি। মোড় বরাবর পৌছিয়েছি, এমন সময় একটা ট্যাক্সি কেনসিংটন হাই স্ট্রীট থেকে ব্যাঁক নিয়ে ডি-ভিয়র্ গার্ডেন্সে ঢুকলো। আমায় চাপা দেয় আর-কি। আমি ঝড়াং ক'রে রাস্তা থেকে একেবারে ফুটপাতে লাফিয়ে পড়লুম।

আমার ঠিক বাঁ-পাশেই কেনসিংটন প্যালেস ম্যানসনের পাঁচতলা বাড়ি উঠে গেছে। ট্যাক্সিটা তারই সামনে থামলো। দেখি, তার থেকে নামছেন স্বয়ং গুরুদেব! রাস্তায় নেমে গুরুদেব তাঁর ঝোল্লা জোব্বার একবার এ-পকেট একবার ও-পকেট হাতড়াতে লাগলেন। গুরুদেব আমাদের অত্যন্ত অন্যমনস্ক-প্রকৃতির লোক। কোথাও যেতে-আসতে গেলে যে সঙ্গে কিছু রেস্ত নিয়ে বেরুনো উচিত, সেটা তিনি সদাসর্বদা ভুলে ব'সে থাকতেন। তাই নিয়ে অনেক অনর্থও বাধাতেন।

বেশ বুঝলুম এ-ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। টাকা সঙ্গে আনেন নি। এখন ট্যাক্সি-ভাড়াটা চুকিয়ে দিতে পারছেন না। আমি একটু এগিয়ে গেলুম। আমায় দেখে গুরুদেব বললেন, 'এই, তোর পকেটে কিছু আছে নাকি? না, আমারই মতন একেবারে শূন্য?' আমি বাক্যব্যয় না ক'রে ট্যাক্সির মিটারের দিকে উঁকি মেরে দেখলুম, তাতে দেড় শিলিং উঠেছে। তার সঙ্গে আরো ছ' পেনি যোগ ক'রে আমি ট্যাক্সি-ভাড়াটা মিটিয়ে দিলুম। ক্যাবী তার মাঝের আঙুলটা টুপিতে ছুঁইয়ে বললে, 'কু।' কু-টা খারাপ কিছুই নয়, থ্যাঙ্ক্ ইউ-এর ককনী অপভ্রংশ।

গুরুদেবের মুখ দেখে মনে হ'লো, তিনি খুবই নিশ্চিন্ত হলেন। অতো রাত্তিরে রথীবাবুর ঘুম ভাঙিয়ে তাঁর কাছ থেকে ট্যাক্সি-ভাড়াটা চাইতে গেলে ব্যাপারটা যে কিরকম-কিরকম হবে— গুরুদেব বোধ হয় তাই ভাবছিলেন। তার উপর প্রতিমা দেবী তখন অসুস্থ। রথীবাবুকে

দিনটায় আর লাঞ্চ খাওয়ানো হবে না। কেবল চা পরিবেশন করা যাবে। সার্ভ করবে অলিভ নিজে। দূরে এককোণে ব'সে আইভি মৃদু স্বরে তার বেহালা বাজাতে থাকবে। তারপর চা-পর্ব শেষ হ'য়ে আসতে দেখলে সে বাজনা বন্ধ ক'রে কাউণ্টারে এসে উঠবে। সেখানে ব'সে বিল্ লিখবে আর টাকা জমা করবে।

সব ঠিকঠাক। বেসমেণ্টে ঢোকবার মুখে সদর-রাস্তার গায়েই অলিভের আঁকা একটা ছবি ঈস্‌লের উপর টাঙানো হ'লো। সেইটেই ম্যানহাটানের সাইনবোর্ড। সেটা চোখে পড়লেই লোকে জানবে, নিচে বেসমেণ্টে খাবার ঘর। সেখানে লাঞ্চ আর চা পাওয়া যায়।

আমি মনে-মনে এক ফন্দি এঁটে রেখেছিলুম। সেটা অলিভ-আইভির কাছে আগে থেকে কিছু ভাঙি নি। গুরুদেব তখন কেনসিংটন প্যালেস ম্যানসনে বাস করছেন। সেটা ম্যানহাটান থেকে মাত্র দু-পাঁচ হাত তফাতে। সেখানে গুরুদেবের কাছে গিয়ে হাতজোড় ক'রে নিবেদন করলুম, 'আজ আপনার চায়ের নেমন্তন্ন। কাছেই একটা নতুন রেস্তোরাঁ খুলেছে, সেইখানেই।'

গুরুদেবের যেমন, সব সময় তাঁর রহস্য! আমার কথা শুনে বললেন, 'তুই চা খাওয়াবি? এ তো ন ভূতং, ভবিষ্যতি কি হবে? না, কোথাও নিয়ে গিয়ে বলবি, নিজের ট্যাঁক থেকে পয়সা বের ক'রে চা খান মশায়।' গুরুদেবের শারদোৎসব নাটকে দু-চার বার লক্ষেশ্বরের পার্ট অভিনয় ক'রে আমার যেমন নাম বেরিয়ে গিয়েছিলো, তেমনি আবার বদনামও একটু হয়েছিলো। জানি না, লোকে কেমন-ধারা ধ'রে নিয়েছিলো, আমি সত্যিই বুঝি হাড়-কেপ্পন।

যা-ই হোক্, পিয়ার্সনসাহেবকে যখন আসতে অনুরোধ জানালুম, তখন গুরুদেব কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। পিয়ার্সনসাহেব তখন গুরুদেবের

সেক্রেটারি, তাঁর সঙ্গে একত্র বাস করছেন। রথীবাবু প্রতিমা দেবী লণ্ডনের বাইরে গেছেন। তাঁদের আর সেদিন পাওয়া গেলো না।

বেলা চারটের সময় গুরুদেবকে আর পিয়ার্সনকে ম্যানহাটানের দিকে নিয়ে চললুম। গুরুদেবের মতন চেহারা তো সহজে লোকের চোখে পড়ে না। রাস্তার লোকেরা একদৃষ্টিতে তাঁর দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইলো। আমরা সিঁড়ি বেয়ে ম্যানহাটানের বেসমেণ্টে নামতে-নামতে দেখি, আমাদের পিছনে একরাশ লোক। তারাও আমাদের সঙ্গে নামতে লেগেছে। তখন চা খাবার সময়। প্ল্যাকার্ড দেখে তারা ঠিক ধরেছে, এখানে পয়সা ফেললে চা পাওয়া যাবে। চায়ের নেশা বড়ো বদ নেশা। ঠিক সময় এক পেয়ালা না পেলে ইংরেজদের পিত্তি প'ড়ে মাথা ধ'রে ওঠে। নামতে-নামতে আইভির বাজানো বেহালার স্বরটা কানে ভেসে আসতে লাগলো।

আমার বন্ধু হার্বার্ট পামারকেও আসতে বলেছিলুম। ঘরে ঢুকে দেখি, তিনি আগেই এসে পড়েছেন। গুরুদেব ঘরের সাজসজ্জা আসবাবপত্তর দেখে তারিফ করলেন। 'বললেন, তুই তো খুঁজে-খুঁজে বেড়ে চা-খাবার জায়গা বের করেছিস।' শুনে, আহ্লাদে আমি আটখানা না হ'লেও চারখানা যে হয়েছিলুম সেটা বলাই বাহুল্য।

পামারকে টেনে এনে গুরুদেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলুম। পামার একজন কবি। কিন্তু কবি-কবি চেহারা তাঁর মোটেই নয়। চুল আমাদের চেয়েও ছোটো ক'রে ছাঁটা। গলায় বড়ো ক'রে একটা বো পর্যন্ত বাঁধা নেই। নিতান্ত সেই মামুলি একরঙা একটা টাই। পরনের স্যুটেও কোনো রং-বেরং-এর বাহার নেই। শাদাসিধে একটা ব্রাউন স্যুট মাত্র। পামার লম্বায় প্রায় গুরুদেবেরই কাছাকাছি যান। কিন্তু চেহারায় কোনো ছিরি নেই। খেতে না-পাওয়া রোগা হাড্ডিসার মূর্তি।

পামারের হাতে একটা আনকোরা নতুন চটি বই। সেটা আমার

হাতে দিয়ে পামার বললেন, 'ওটা তোমার জন্যেই এনেছি।' খুলে দেখি, পামারেরই লেখা গোটা-তিরিশেক কবিতার সংগ্রহ। হোগার্থ প্রেস ছাপিয়েছে।

তখন ইংরিজি কাব্যরাজ্যের অধিপতি ছিলেন জন্ স্কুয়্যার। তখনো তিনি নাইট হন নি। নবীন কবিদের কাব্যজগতে ঢুকতে হ'লে জে. সি. স্কুয়্যারের পাসপোর্ট লাগতো। পামারকে স্কুয়্যার ছাড়পত্র দেন নি। তাই তখনো পামারের বিশেষ নামডাক হয় নি। তবে লেনার্ড উল্ফ্ সাচ্চা লোক, সমঝদার ব্যক্তি। তিনি পামারের কবিত্বশক্তির পরিচয় পেয়ে নিজের হোগার্থ প্রেস থেকে পামারের ক'খানা কবিতা ছাপিয়ে দিয়েছেন।

আমরা কোণের ডিভানটা অধিকার ক'রে বসলুম। সেখান থেকে তাকিয়ে দেখলুম, ঘরভর্তি লোক। অলিভ সব অতিথিকে একে-একে চা খাবার সার্ভ ক'রে যাচ্ছে। পুরনো গ্রীক ড্রেসে তাকে মানিয়েছে বেশ। অতিথিদের সবাইকার হাসি-হাসি মুখ। গুরুদেবকেও খুশি দেখলুম। বরাবরই দেখে আসছি, সুন্দর পরিচ্ছন্ন পরিবেশে তাঁর মনটা আপনা হ'তেই বেশ প্রসন্ন হ'য়ে ওঠে।

আরামে চা খাওয়া চলছে। আমি মজা দেখবার জন্যে আঙুলের খোঁচা মেরে পামারের কানে-কানে ফিসফিস ক'রে বললুম, 'গুরুদেবকে তোমার দু-একখানা কবিতা শুনিয়ে দাও না।' গুরুদেবের সঙ্গে কাব্য-আলোচনা ক'রে পামার তখন রসে ভরপুর। আমার খোঁচা খেয়ে তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলেন।

তারপর সমানে চললো একটার-পর-একটা কবিতা আবৃত্তি।

ঘরসুদ্ধু লোক স্তব্ধ। অলিভের হাতের ট্রে হাতেই র'য়ে গেলো। আইভির বাজনা বন্ধ হ'য়ে এলো। লোকে চা খেতে ভুলে বসলো। পামারের গলা খুবই ভালো। কোনোরকম জড়ানো উচ্চারণ নয়।

আর, সচরাচর ইংরেজদের যেমন লোককে কবিতা প'ড়ে শোনাতে লজ্জা বোধ হয়, হার্বার্ট পামারের সে-সব বাজে লাজ-লজ্জা ছিলো না।

উপরি-উপরি গোটা চার-পাঁচ কবিতা প'ড়ে যাবার পর পামার দম নেবার জন্যে একটু থামলেন। এতক্ষণ শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে বসেছিলো। কখনো তো তারা এমনধারা শোনে নি। পামার থামতে তাদের যেন ধ্যানভঙ্গ হ'য়ে গেলো। তখন চারদিক থেকে জোর-জোর ক্ল্যাপ পড়তে লাগলো। তাই শুনে হাতের বইটা মুড়ে সেটা আমার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর কথাটি না ক'য়ে পামার হনহনিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কিসের থেকে যে কি ঘটলো, ঠিক ঠাওর ক'রে উঠতে পারলুম না। কেবল গুরুদেবই ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'চল্, আর না।' ইংরেজ জাতটা বড়োই বদরসিক। অগত্যা আমাকেও উঠতে হ'লো। পিয়ার্সনসাহেবও উঠলেন। পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখলুম, অতিথিদের চা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে। তাঁরা আবার গরম চায়ের অর্ডার দিচ্ছেন। গুরুদেব তাঁদের টেবিলের পাশ দিয়ে চ'লে যাবার সময় তাঁরা সকলেই খাওয়া ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে তাঁকে বাও করতে লাগলো। গুরুদেবও দিশি প্রথায় বদ্ধাঞ্জলি হ'য়ে তাঁদের প্রতিনমস্কার ক'রে চললেন।

পরদিন অলিভ-আইভির মুখে শুনলুম, ওই একদিনে চা বিক্রি ক'রে নাকি তাদের ক্যাপিটালের সিকি উঠে এসেছে। পামারের মুখে শুনলুম, লোকদের হাততালিতে তাঁর মনের সুরে এমনি তাল কেটে গিয়েছিলো যে, তিনি কিছুতেই আর সে-সুর জোড়া দিতে পারলেন না। মনের মধ্যে অসম্ভব যন্ত্রণা অনুভব করতে লাগলেন। তার থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে তাড়াতাড়ি দূরে পালিয়ে গিয়ে বাঁচলেন। গুরুদেব তা হ'লে তো ঠিকই অনুমান করেছিলেন।

অলিভ-আইভির ম্যানহাটানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হ'তে লাগলো।

পাঁচ বছর পর আবার বিলেত গিয়ে দেখি, তারা ওটা বিক্রি ক'রে দিয়ে দু-বোনেই বিয়ে ক'রে সংসারী হয়েছে। হার্বার্ট পামার সার্ জন্ স্কুয়্যারের পাসপোর্ট না পেয়েও কাব্যজগতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছেন।

আমার কাছে পামারের একটা স্মৃতিচিহ্ন র'য়ে গেছে। বহুকাল পূর্বে প্রায় ছেলেবয়সেই, শান্তিনিকেতনের মেঠো রাস্তা দিয়ে আসতে-আসতে এক গোরুর গাড়ির গাড়োয়ানের মুখে আমি একটা গ্রাম্য গান শুনি। সেই থেকে সেই গানটি বার-বার ঘুরে-ফিরে আমার মনে ভেসে বেড়াতো। একদিন পামারকে সেটা শুনিয়ে তার মর্মার্থ বলায়, পামার তার একটা ইংরিজি পোশাক তৈরি ক'রে দিয়েছিলেন।

গানটা এই রকম :

বন পোড়া যায় সবাই দেখে,
আমার মন পোড়ে কেউ দেখে না—
বন গেলো, আগুন গেলো—
আমার মনের আগুন জ্বলে দ্বিগুণ,
তারে আর নিবানো যে যায় না।

পামারের দেওয়া রূপ :

The forest-fire is seen of all ;
My love-fire there is none to see,
The forest gone, the fire is out ;
My heart-fire ever rages in me.

সেদিন পুরনো কাগজপত্তর ঘাঁটতে-ঘাঁটতে এই দু-ছত্র লেখা চোখে পড়লো। তাইতেই সব কথা একে-একে মনে প'ড়ে গেলো।

জন্

আমরা তাকে শুধু জন্ ব'লেই জানতুম। নিশ্চয়ই তার একটা কোনো পৈতৃক পদবী ছিলো। কিন্তু তা নিয়ে আমরা কেউ কোনোদিন মাথা ঘামাই নি। আমাদের কাছে কেবল জন্ই ছিলো যথেষ্ট।

এক-সময় জন্ লণ্ডন শহরে ক্যাব অর্থাৎ ঘোড়ার গাড়ি হাঁকাতো। সে মহারানী ভিক্টোরিয়ার আমলে। তারপর এলো ট্যাক্সিক্যাবের যুগ। তাতে ক'রে ফোরউইলর হ্যান্সম ক্রুহ্যাম— সবই একে-একে উঠে গেলো। জন্ নতুন ক'রে ট্যাক্সি চালানো শিখতে পারলো না।

শেখবার ইচ্ছেও বোধ হয় জন্-এর বড়ো বেশি ছিলো না। সেকালের সব লোকের মতন জন্-এরও কলের গাড়ির উপর কেমন যেন একটু তাচ্ছিল্যের ভাব। বলতো— আমি চিরকাল ঘোড়া চালিয়েই এসেছি। স্টিয়ারিং-য়ুইলে আমার হাত বসে না। ওতে যেন কোনো আরাম পাই নে। হ্যাঁ, ঘোড়া হাঁকানো— সে অন্য চিজ্।

জন্ আর-এক ব্যবসা ধরলে। এখন সে একটা ক্যাবস্টলের মালিক। এই ক্যাবস্টলের একটু পরিচয় দেওয়ার দরকার। নইলে ব্যাপারটা সকলে সঠিক না-ও বুঝে উঠতে পারেন। চার চাকার উপর বসানো একটা ছোট্টো কাঠের ঘরের মতন গাড়ি। তার ভিতর আছে টুকিটাকি রাঁধবার কিছু সরঞ্জাম। আর আছে কিছু পরিবেশনের পাত্র —এই খানকয়েক পেয়ালা-পিরিচ, পেলেট-গেলাস, দস্তার কাঁটা-চামচ।

রান্না সামান্যই। জন্-এর ক্যাবস্টলে পাওয়া যেতো ডিমসেদ্ধ হ্যাম্-স্যাণ্ডউইচ ফিশ্ অ্যাণ্ড চিপ্ আর রোস্ট-করা ডুমো-ডুমো

ওয়ালনাট্। ধোঁয়া-ওঠা গরম এক পেয়ালা কফির সঙ্গে তার যে-কোনো একটা খেতে বেশ উপাদেয়। স্টলটা রাস্তার উপরেই। স্টলের কাউণ্টারে ঠেসান দিয়ে পথে দাঁড়িয়ে খাওয়া— সে বড়ো এক মজাদার ব্যাপার।

দিনমানে ক্যাবস্টলগুলো দেখতে পাওয়া যায় না। ভোররাত্রে চাকাসুদ্ধু স্টল টেনে নিয়ে গিয়ে মালিকের বাড়ির কাছে রাখা হয়। সন্ধ্যের মুখে আবার যে যার স্ব-স্ব স্থানে ফিরে আসে। থিয়েটার-সিনেমা-ফেরতা, পার্টি-নাচের মজলিশ-ফেরত ফুলবাবুরা ক্যাবস্টল থেকে একটু-কিছু মুখে না দিয়ে কেউ ঘরে ফেরেন না।

জন্-এর স্টলটা ছিলো আমাদের পাড়ার মধ্যেই। আমাদের বাড়ির রাস্তা থেকে দুটো মোড় নিলেই জন্‌কে দেখতে পাওয়া যেতো। স্টলের ভেতর সে খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে। একমাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া পাকা চুল। গালের দু-ধার বেয়ে দুটো মটনচপ দাড়ি। থুঁতনির সমস্তটাই কামানো। গোঁফ পরিষ্কার ক'রে চাঁচা। ভারী সৌম্যমূর্তি।

জন্-এর পরনে সেই কবে-উঠে-যাওয়া মর্চে-পড়া এক কালো ফ্রককোট। সেটা হাঁটুপর্যন্ত নেমে গেছে। গলায় টাই কলার কিছু নেই। তার জায়গায় একটা প্রকাণ্ড শাদা সিল্কের রুমাল মাফলারের মতন ক'রে জড়ানো। ছ'ফুট লম্বা জন্‌কে এই পোশাকেই ঠিক মানাতো। হাল ফ্যাশনের কোর্তা-কুর্তিতে তার চেহারা মোটেই ততো খোলতাই হ'তো না। জন্-এর শান্ত শুভ্র সেকেলে চেহারায় সে-সব বড়োই বে-মানান ঠেকতো ব'লে আমার বিশ্বাস।

আমাদের পাড়াটা কোনো থিয়েটার-বায়স্কোপের কাছে নয়। লোক চলাচলের পথেও পড়ে না। শান্ত শিষ্ট নেহাত নিরীহ ভদ্রলোকদের বাসস্থান। অতি নির্জন ঠাণ্ডা পাড়া। কোথাও টুঁ শব্দটি পর্যন্ত

নেই। তাই আমরা মাঝে-মাঝে জন্‌কে অনুযোগ করতুম— তুমি বাপু পিকাডিলি সার্কাস কি লেস্টার স্কুয়্যার কি নিতান্ত পক্ষে শাফট্‌স্‌বরী অ্যাভিনিউ অঞ্চলে তোমার স্টল নিয়ে যাও না কেন? তা হ'লে তো বিক্রিসিক্রি ভালোই হয়। জন্ একটু ফিকে হাসি হেসে বলতো— ও-সব জায়গা আমার জন্যে নয়, ছেলে-ছোকরাদের জন্যে। আমার এই বেশ। সঙ্গে-সঙ্গে একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়তো, দেখতুম। বোধ হয়, পুরনো সেই দিনের কথা ভেবে।

কিন্তু এখানেও জন্‌-এর বিক্রি মন্দ নয়। পাড়ার সবাই জন্‌কে ভালোবাসে। জন্‌-এর যথেষ্ট ধর্মবুদ্ধি ছিলো। খাবার দিতো খুব ভালো, আর দাম নিতো খুব কম। ছ' পেনিতে খাসা সাপার হ'তো। জন্‌-এর রান্নার হাত পরিপাটি। তার তৈরি হ্যাম্‌-স্যাণ্ডউইচ ফিশ্ অ্যাণ্ড চিপ্ অতি সুস্বাদু। কফি অত্যুৎকৃষ্ট। তাই ভদ্রলোকরা সবাই ফিরে-ফিরে জন্‌-এর স্টলে বার-বার খেতে আসতেন।

রোববার ছাড়া আমি প্রত্যহ দু-বার ক'রে জন্‌-এর স্টলে যেতুম। একবার সন্ধ্যের দিকে, যখন সে সবে আড্ডা গেড়েছে। তখন গল্প করবার জন্যে। আর-একবার রাত্তির সাড়ে দশটা-এগারোটায়। তখন যেতুম খাবার জন্যে। আমাদের জন্ ধার্মিক ক্রীশ্চান। রবিবারে পারতপক্ষে কখনো দোকান খুলতো না। শুনেছিলুম, ওইদিন সকাল-সন্ধ্যে দু-বেলাই সে গির্জেয় যেতো। দুপুরে নাকি বাইবেল খুলে বসতো।

নিঃসঙ্গ বিদিশি ছাত্র দেখে আমার উপর জন্‌-এর কেমন-একটু মায়া প'ড়ে গিয়েছিলো। সন্ধ্যেবেলায় স্টল সাজিয়ে সে আমায় কতো রকমের গল্প ক'রে শোনাতো। পুরনো লণ্ডন শহরের কতো বিচিত্র কাহিনী। অলিগলির কতো মজার রহস্য। আমার মতন আগ্রহী শ্রোতা বোধ হয় জন্‌-এর দ্বিতীয় আর-একটি ছিলো না।

বাস্তবিকই জন্-এর মুখে গল্প শুনতে আমার ভারী ভালো লাগতো। সেকালের কতো ঘরোয়ানা ঘরের কথা, কতো অ্যাক্টর-অ্যাকট্রেসের কথা, কতো লেখক-আর্টিস্টের কথা। কতো রকমের ছিটগ্রস্ত বাতিকগ্রস্ত লোক। কী অদ্ভুত তাদের খামখেয়ালী ভাব। এক ব্যক্তির তো একবার মাথায় বাই চাপায়, তিনি জন্‌কে জোর ক'রে ধ'রে তার গাড়ির ভিতর বসিয়ে দিয়ে নিজেই কোচবাক্সে চ'ড়ে গাড়ি হাঁকাতে শুরু ক'রে দিয়েছিলেন। ভাগ্যিস্ কোনো অ্যাক্‌সিডেণ্ট হয় নি, তাই রক্ষে।

একটা ব্যাপার নিয়ে জন্-এর বড়োই গর্ব ছিলো। সে একবার তার গাড়িতে ক'রে ইংল্যাণ্ডের রাজা এড্‌ওয়ার্ড দি সেভেন্থকে তাঁর বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিলো। এড্‌ওয়ার্ড তখনো রাজা হন নি, প্রিন্স্ অভ্ ওয়েল্‌স আছেন। এড্‌ওয়ার্ডের মা, কুইন ভিক্টোরিয়া বড়োই রাশভারী জবরদস্ত-প্রকৃতির মহিলা। তাঁর হাপায় প'ড়ে যুবরাজের খেল্ খেলতে-খেলতে এড্‌ওয়ার্ডের প্রাণ হাঁপাই-হাঁপাই করতো। তাই মাঝে-মাঝে সামান্য লোকদের মতন বেশভূষা ক'রে তিনি অনুচরদের দৃষ্টি এড়িয়ে গোপনে বাইরে বেরিয়ে পড়তেন।

একদিন রাত্তির বারোটার সময় যুবরাজ ছদ্মবেশে পিকাডিলি সার্কাসের আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ তাঁর কেমন মনে হ'লো, রাস্তার লোক বোধ হয় তাঁকে চিনে ফেলছে। অনেক বড়োঘরের ছেলে গভীর রাত্তিরে পিকাডিলি সার্কাসের এধার-ওধার ঘুরে বেড়ান। কি কারণে, সেটা আর খুলে ব'লে দিচ্ছি নে। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ প্রিন্স অভ্ ওয়েল্‌স-এর চেনা লোক থাকতে পারেন। তাঁরা যে ছদ্মবেশেও যুবরাজকে চিনে ফেলবেন, তাতে আর আশ্চর্য কি!

সৌভাগ্যক্রমে জন্ সেই সময় তার গাড়ি নিয়ে ধিকিধিকি চালে সেইখান দিয়ে চলেছে। যদি একটা শেষ সোয়ারি পাওয়া যায়।

এমন সময় হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই, যুবরাজ গাড়ির পাদানে চ'ড়ে খপ ক'রে দরজার হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে টপ ক'রে গাড়ির ভেতর ঢুকে পড়লেন।

জন্ অমন কাণ্ড অনেক দেখেছে। তাই সে অবাক হ'লো না। কেবল গাড়ির ছাদের ফাঁক দিয়ে একবার জিগ্যেস করলে, কোথায় নিয়ে যেতে হবে। গন্তব্যস্থানের নাম শুনে জন্-এর চক্ষু চড়কগাছ! এ যে যুবরাজের রাজবাড়ি! তাই তো— ব'লে ছাদের ফাঁক দিয়ে উঁকি মেরে জন্ দেখে, সত্যিই তো, যুবরাজই তো বটেন। ঠিক সেই ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। পোশাক বদলালেও দাড়িটা তো আর বদলাতে পারেন নি।

যুবরাজ বাড়ি পৌঁছে গাড়িভাড়ার উপর জন্‌কে একটা সভ্‌রিন বকশিশ করেছিলেন। সেই সভ্‌রিন এখনো জন্-এর পেটজোড়া ঘড়ির চেনের সঙ্গে লকেটের মতো ক'রে ঝোলানো। স্ফূর্তির চোটে জন্ যখন-তখন সেই সভ্‌রিন নেড়ে-চেড়ে আমায় দেখায়। সসম্ভ্রমে তার উপর হাত বোলাতে থাকে।

গল্প করতে-করতে কখনো-কখনো জন্ হঠাৎ দু-এক কলি গান ছেড়ে বসে। ভালো গলা। তবে আমাদের কাছে বিলিতি গানের গলা কেমন যেন কিরকম-কিরকম ঠেকে। গানটা পুরনো। ডেসী-ডেসী ব'লে তার আরম্ভ। গানের মাথামুণ্ডু কিছু নেই। এক ব্যক্তি ডেসী নাম্নী এক মহিলাকে প্রেমনিবেদন ক'রে বিবাহ-ব্যাপারে তাঁর সম্মতি চাচ্ছেন। কিন্তু আগে-ভাগেই সাবধান ক'রে দিচ্ছেন, বিবাহে তিনি কোনো স্টাইল দেখাতে কি ঘটা করতে পারবেন না। কেন না, টঙ্কাদেবী তাঁর ট্যাঁক শূন্য ক'রে পালিয়েছেন। তবে তিনি কোনোক্রমে দু-জন বসবার একটা বাইসিক্‌ল জোগাড় ক'রে আনতে পারবেন। আরো

তাঁর বাবার জন্যে অনেক সইতে হয়, অনেক-কিছু ধকল সামলাতে হয়। কিন্তু এতটা ঠিক সইবে কিনা, তাই ভেবে গুরুদেব একটু ইতস্তত করছিলেন ব'লে মনে হ'লো।

আমি কাছে যেতে গুরুদেব বললেন, 'রোটেনস্টাইন-এর বাড়িতে খাওয়া-দাওয়া ক'রে ফিরছি। গল্পগুজবে অনেক রাত্তির হ'য়ে গেছে দেখছি। তা তুই এতো রাত্তিরে কোথায় বেরিয়েছিস? পড়াশুনো কিছু করিস নে বুঝি?'

আমি বললুম, 'তা কেন? এই তো এতোক্ষণ উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য পড়ছিলুম। পড়তে-পড়তে মাথা গরম হ'য়ে উঠেছে।'

'তাই বুঝি মাথাটা ঠাণ্ডা করবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়েছিস?' গুরুদেব প্রশ্ন করলেন। গুরুদেবের সব সময় হাসিঠাট্টা লেগেই আছে। বিশেষত তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের সঙ্গে।

আমি নিবেদন করলুম, 'কতকটা তাই বটে। জন্-এর স্টলে গিয়ে এখুনি এক পেয়ালা গরম কফি খেয়ে ফেললে মাথাধরাটা ছেড়ে যাবে।'

জন্-এর কথা গুরুদেবকে সব খুলে বললুম। ব'লেই তাঁকে ধ'রে বসলুম, 'চলুন না, একবার জন্-এর স্টলে। জন্ কতো খুশি হবে দেখবেন।' আমার তখন অল্প বয়েস। তাই ধৃষ্টতার সীমা-পরিসীমা ছিলো না।

গুরুদেব আমার দিকে একবার তাঁর অন্তর্দৃষ্টি হানলেন। একটু হাসলেন কিনা সেটা তাঁর গোঁফদাড়ির আড়াল থেকে ঠিক ধরতে পারলুম না। তারপর শুধু বললেন, 'চল্।'

আমি লাফিয়ে উঠে বললুম, 'চলুন, এই কাছেই। আর-একটা মোড় ফিরলেই জন্-এর স্টল।'

নির্জন নিশুতি রাত। পথে বিলিতি ম্লান জ্যোৎস্নার একটু আবছা আলো। গুরুদেব আর আমি পাশাপাশি চলেছি।

জন্-এর স্টলে পৌঁছবার আগেই গুরুদেবকে একটু পিছনে রেখে আমি খানিকটা এগিয়ে গেলুম। জন্‌কে আগের থেকে সাবধান ক'রে দিতে হবে, গুরুদেব আসছেন। সে যেন গুরুদেবকে সসম্মানে গ্রহণ করে।

স্টলের কাছে পৌঁছতে-না-পৌঁছতেই দেখি এক আশ্চর্য দৃশ্য! অনেক রাত্তির হ'য়ে গেছে। জন্-এর স্টলে একটিও লোক নেই। জন্ একেবারে স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে। তার চাউনি অনুসরণ ক'রে দেখি, দূরে গুরুদেবেরই উপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ। গুরুদেব তখন মাথার মখমলের লম্বা টুপিটা খুলে ফেলেছেন। সামনের বড়ো-বড়ো বাড়িগুলোর মাথার উপর দিয়ে পানসে-গোছের একফালি চাঁদ বেরিয়ে এসেছে। তারই মৃদু আলো একটুখানি গুরুদেবের ঠিক মুখের উপর এসে পড়েছে।

দেখতে-দেখতে জন্ হাঁটু গেড়ে মাটিতে নিল্‌ডাউন হ'য়ে বসলো। তার দু-খানা হাত একত্র জোড়করা। পিছন ফিরে দেখি, গুরুদেব তাড়াতাড়ি সে-জায়গা ছেড়ে চ'লে যাচ্ছেন। লণ্ডনের রাস্তাঘাট গুরুদেবের মোটেই সড়গড় নয়। কোথায় যেতে শেষে কোথায় গিয়ে পড়বেন ভেবে আমি প্রায় দৌড়ে গিয়েই তাঁকে ধরলুম। সেইখানটায় রাস্তার বাঁক। একপাক ঘুরতেই জন্-এর স্টলটা চোখের আড়াল হ'য়ে গেলো।

যেতে-যেতে একটি কথাও হ'লো না। নিঃশব্দে গুরুদেবকে কেনসিংটন প্যালেস ম্যানসন-এর নাইট পোর্টারের হাতে জিম্মা ক'রে দিয়ে এলুম।

আবার জন্-এর স্টলেই ফিরে গেলুম। আমায় দেখে জন্ বললে,

'চ্যাটার্জি, আমার জীবন ধন্য। করুণাময় লর্ড যীজস্ ক্রাইস্ট দূর থেকে আজ আমাকে দর্শন দিয়ে গেছেন। আমার জীবন সার্থক।'

জন্-এর মুখে অপার শান্তি!

আমার মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বেরুলো না। কিছু না-খেয়েই সে-রাত্তির বাড়ি ফিরলুম।

তারপর আবার একবার বিলেত গিয়েছিলুম। আমি সেই পুরনো বাড়িতেই উঠেছি। এবারও গুরুদেব আছেন। কিন্তু এবার আর কেনসিংটন প্যালেস ম্যানসন-এ নয়, রেজিনা হোটেলে। রথীবাবুও সঙ্গে আছেন, প্রতিমা দেবীও আছেন।

কেবল নেই আমার বন্ধু জন্। তার জায়গাও শূন্য। সেখানে আর কেউ স্টল খোলে নি।

তারপর কতো দিন চ'লে গেলো। কিন্তু এখনো গুরুদেবের একটা ছবি হাতে পড়লে সঙ্গে-সঙ্গেই জন্-এর কথা মনে প'ড়ে যায়।

মডেল

ন্যাশনল গ্যালারিতে ছবি দেখতে গিয়েছিলুম। তখন লণ্ডনে বেশ কিছুদিন থাকা হ'য়ে গেছে। কিন্তু তখনো ন্যাশনল গ্যালারিতে যাওয়া হয় নি। এর প্রধান কারণ, গ্যালারি এগ্‌জিবিশন মিউসিয়ম—এ-সবের নাম শুনলেই আমি আঁতকে উঠে বিভীষিকা দেখি। ও-সব জায়গায় গেলেই আমার মাথা ধ'রে ওঠে। উত্তম মধ্যম অধম সব-রকমের ছবি স্কাল্‌প্‌চর আর্ট অব্‌জেক্টস পাশাপাশি সাজানো। দেখতে-দেখতে চোখ ধ'রে যায়, মন ম'রে যায়, মেজাজও তিরিক্ষে হ'য়ে ওঠে। কোনো-কিছুই ভালো ক'রে দেখা হয় না। মনের কোথাও একটু দাগ পড়ে না।

এর চেয়ে জাপানী রীতি ঢের ভালো। জাপানে ওরা একটি ক'রে ছবি এক-একবার দেয়ালে টাঙায়। তারপর একহপ্তা কি দু-হপ্তা ধ'রে ভালো ক'রে দেখতে-দেখতে সেটা যখন মনের মধ্যে গেঁথে যায় তখন সেটাকে নামিয়ে রেখে আর-একটা ছবি বের করে। ফলে, তারা বেশ চেখে-চেখে ছবির রস উপভোগ করতে পারে। ছবি তাদের মনকে অবসন্ন ক'রে তোলে না।

যাই হোক, তবু যেতে হয়েছিলো। না-গিয়ে করি কি! অতোদিন লণ্ডন শহরে বাস ক'রে ন্যাশনল গ্যালারি দেখি নি বললে লোকে বলবে কি? লণ্ডনে থিতু হবার আগেই তো লোকে প্রোগ্রাম ক'রে ন্যাশনল গ্যালারি ব্রিটিশ মিউসিয়ম সেণ্ট পল্‌স গির্জে লণ্ডন টাওয়ার ব্যকিংহাম প্যালেস পার্লামেণ্ট হাউস ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবি ইত্যাদি কতো-কি

একে-একে পালা ক'রে সেরে নেয়। আর আমি? আমার তো প্রায় দু-বছর ও-দেশে হ'তে চললো।

লণ্ডনে দিনের আলো দুর্লভ। ইলেকট্রিক আলোতে আর যা-ই করা যাক না কেন, ভালো ক'রে ছবি দেখা যায় না। তবু পিত্তিরক্ষা করার মতো এক-এক ক'রে ন্যাশনল গ্যালারির ছবিগুলো দেখে চললুম। অনেক বড়ো-বড়ো নামজাদা আর্টিস্টের ছবি গাদাগাদিতে পাশাপাশি সারবন্দি হ'য়ে আছে। কিন্তু কোনো ছবিরই মর্ম ঠিক বুঝতে পারি না। চোখেই শুধু দেখছি, কোনোটাকেই মনে নিতে পারছি না। যাই হোক, তবু তো দেশে গিয়ে গল্প করতে পারবো, বিলেতের ন্যাশনল গ্যালারি দেখে এসেছি।

সেদিন মোটেই ভিড় ছিলো না। আপন-মনে ছবি দেখে চলেছি। হঠাৎ থমকে দাঁড়াতে হ'লো। চোখের সামনে একটি মেয়ে। আমার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। সামনের এক ছবিতে বেহুঁশ হ'য়ে ডুবে আছেন। ছবিটা সম্পূর্ণ নগ্ন এক অপূর্ব রূপসীর। মেয়েটি সব ভুলে সেই ছবির দিকে একদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন।

ইংরেজ মেয়েদের সামনের চেয়ে পিছন থেকে দেখতে ভালো। এ-বিষয়ে অথরিটি আমাদের গোলাপ রায়। এ-সম্বন্ধে তাঁর রায় আমার কাছে বেদবাক্য। কারণ, তিনি বহুদিন ধ'রে লণ্ডনে আছেন। মেয়েও দেখেছেন অনেক।

গোলাপ রায় বলেছিলেন, একবার এক ইংরেজ মেয়েকে পিছন থেকে দেখে তিনি এতোই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, ঝাড়া দু-মাইল রাস্তা মেয়েটির পিছন-পিছন হেঁটে গিয়েছিলেন। তারপর মেয়েটি যেই হঠাৎ একবার মুখ ফেরালেন, ওমনি গোলাপ রায় এক চলন্ত বাসের উপর একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। ভাগ্যিস কন্‌ডাক্টর তাঁকে জাপ্‌টে ধরেছিলো,

নইলে সে-যাত্রা গোলাপ রায়কে নির্ঘাত দু-মাস হাসপাতালে পা ভেঙে প'ড়ে থাকতে হ'তো।

যে-মেয়েটি নিবিষ্ট মনে ছবি দেখছিলেন, পিছন থেকে দেখে কেউ তাঁকে সুন্দরী ব'লে ভ্রম করলে কিছু দোষ দেওয়া যায় না। আমি একটু-একটু ক'রে এগোতে-এগোতে যখন প্রায় তাঁর কাছাকাছি পৌঁছিয়েছি তখন তিনি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন। সে এমনি চকিতে যে, আমাদের গায়ে-গায়ে ঠোকাঠুকি হ'য়ে যায় আর-কি। আমি তাড়াতাড়ি একটু স'রে গিয়ে বললুম, 'দোষ আমারই, ক্ষমা করবেন।' তিনি বললেন, দোষটা তাঁরই, আমি যেন তাঁকে মাফ করি।

ব্যস, এতেই আলাপ শুরু হ'য়ে গেলো। হওয়াটা উচিত ছিলো না। কারণ, ওটা এটিকেট নয়। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে দোষ সত্যি কার, তাই সাব্যস্ত করতে গিয়ে যে-কথা একবার শুরু হ'য়ে গেলো, সে-কথা আপন বেগেই বেয়ে চললো। তাকে আর থামানো গেলো না।

মেয়েটি বললেন, 'আপনাকে যেন ভারতবাসী-ভারতবাসী ব'লে মনে হচ্ছে?'

আমি বললুম, 'আমার গায়ের রং দেখে আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন, ম্যাডাম।'

'আজ্ঞে না মশায়, আপনার গায়ের রং দেখে আদবেই নয়, আপনার চোখ দেখে।'

'চোখ?'

'হ্যাঁ, চোখ। ভারতবর্ষীয়দের চোখে কি যেন কি-একটা আছে। দুটো চোখ সর্বদা কোন দূর-দূরান্তে যেন কি খুঁজে-খুঁজে বেড়াচ্ছে— যা কখনো ধরা-ছোঁয়া যায় না।'

'আমাদের কবি বোধ হয় তাই বলেছেন, আমি সুদূরের পিয়াসী।'

'সুদূরের পিয়াসী ? বেশ কথাটা তো। ওটা মনে রাখতে হবে।'

'তা রাখবেন। কিন্তু এ-পর্যন্ত কোনো পুরুষমানুষ আমার চোখে কিছু দেখতে পেয়েছেন ব'লে জানান নি। কোনো মেয়ে তো ওদিকে দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করেন নি। সুতরাং—'

'সুতরাং প্রমাণ হ'য়ে গেল যে, তাঁদের দৃষ্টিশক্তি বড়োই কম।'

এর পর আমার মুখে আর কথা জোগালো না। আমি অপ্রতিভভাবে দাঁড়িয়ে রইলুম। একেই তো অনাত্মীয় মেয়েদের সঙ্গে সপ্রতিভভাবে কথা কওয়ার অভ্যেস কস্মিনকালেও নেই। তার উপর এইরকম কথার পিঠে টকাটক কথা।

লণ্ডনে এসে যে পাঁচ-সাত জন স্ত্রীলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশ হয় বুড়ি, না হয় আধ-বয়েসী। যা এক-আধ জন অল্পবয়েসী আছেন, তাঁরা আমার ভারিক্কে চেহারা দেখে আমাকে অত্যন্ত সমীহ ক'রে চলেন। খুবই সসংকোচে কথা কন। এ-মেয়েটি দেখি, তাঁদের ধার দিয়েও যান না।

আমাকে হতভম্ব হ'য়ে থাকতে দেখে মেয়েটি বললেন, 'দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পা ধ'রে গেল যে। চলুন, বসা যাক।'

একের-পর-এক ছবি দেখতে-দেখতে ক্লান্ত হ'য়ে পড়াটা নিতান্ত স্বাভাবিক। এটা জেনেই বোধ হয় কর্তৃপক্ষ গ্যালারি-ঘরের মাঝে-মাঝে সোফার মতো বসবার আসনের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। তারই একটায় ব'সে প'ড়ে মেয়েটি তাঁর পাশের জায়গাটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আমায় সেখানে বসবার ইঙ্গিত করলেন। অগত্যা তাঁর পাশেই বসতে হ'লো। একটা মৃদু সুগন্ধ নাকে এসে ঠেকলো। কিসের, তা ঠিক ঠাওর করতে পারলুম না। তবে সেণ্টের নয়।

সামনা-সামনিতেও মেয়েটিকে সত্যিই ভালো দেখতে। চেহারাটা

একটু ঘসামাজা ক'রে থাকলেও খালি-চোখে সেটা ধরা পড়ে না। সাজগোজ কোথাও স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে নি। এ একটা নতুন জিনিস। মেয়েরা সামান্য সাজসজ্জা করলেই ধরা প'ড়ে যান যে, সেজেছেন। কিন্তু এই মেয়েটির সমস্ত সাজটা এমনই মানানসই যে, বাংলায় তার ঠিক বর্ণনা দেওয়া যায় না। ফরাসি শ্ল্যাং-এ একে এককথায় বলা যেতে পারে, শিক্।

মেয়েটি এক-সেকেণ্ড আন্দাজ আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললেন, 'আপনি এখানে এসেছেন কেন? আপনার চোখ দেখে মনে হচ্ছে, আনন্দ তো একবিন্দুও পান নি, উল্টে সবটা মিলে আপনার কাছে যেন এক অসম্ভব বোরিং ব্যাপার হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।'

আমি বললুম, 'একবার ন্যাশনল গ্যালারিটা দেখে না গেলে লোকে কি বলবে!'

'ওঃ! তাই? তা হ'লে বাইরের থেকে বাড়িটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে চ'লে গেলেই তো পারতেন! ভিতরে ঢুকলেন কেন? একটা ঘটনা মনে প'ড়ে গেলো। বলি, শুনুন:

'আমি তখন প্যারিসে। মিলোর শ্বেতপাথরে গড়া ভিনাস-এর মূর্তিটা একবার স্বচক্ষে দেখবো ব'লে গিয়েছি। লুভ্ মিউসিয়মের সামনেই একটা কাফেতে ব'সে এক পেয়ালা চকোলেট খেয়ে নিচ্ছি, এমন সময় টমাস কুক-এর এক প্রকাণ্ড শারাবাঙ্ক এসে লুভ্-এর ঠিক গেটের সামনে দাঁড়ালো। গাড়ি-ভর্তি একরাশ অ্যামেরিকান মেয়ে-পুরুষ।

'টমাস কুক-এর গাইড সিট ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে চিৎকার ক'রে হাঁকলো— লেডিস অ্যাণ্ড জেন্টল্‌মেন, চেয়ে দেখুন, এই সেই বিখ্যাত লুভ্। পৃথিবীর সব্‌সে বড়ো আর্ট কলেকশন এইখানেই ধরা আছে। অমনি যাত্রীরা সবাই দাঁড়িয়ে উঠে যে যাঁর ক্যামেরা বের ক'রে পটাপট

লুভ্‌-এর ছবি তুলে নিলেন। শারাবাঙ্ক আবার এগিয়ে চললো। বোধ হয় তখনো অনেক-কিছু তাঁদের দেখতে বাকি। আর দেরি করতে পারেন না।'

বলবার ধরন দেখে আমি হাসি চাপতে পারলুম না। সজোরে হেসে উঠলুম। মেয়েটি সাবধান ক'রে দিলেন, 'চুপ চুপ। এ-দেশে অতো জোরে হাসতে নেই। যদিও এ-রকম প্রাণখোলা হাসি শুনে আমি নিজে খুব খুশি হ'য়ে উঠি।'

এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি, ন্যাশনল গ্যালারির উর্দিপরা চাপরাশিগুলো ভুরু কুঁচকে আমার দিকে কটমট ক'রে তাকিয়ে আছে। হাসি আপনা হ'তেই থেমে গেলো।

আমি মেয়েটিকে জিগেস করলুম, 'আপনি বোধ হয় ছবি দেখতে খুব ভালোবাসেন। তাই বুঝি এসেছেন?'

'মোটেই না। আমি বাধ্য হ'য়ে মাঝে-মাঝে আর্ট-গ্যালারিতে ঘুরি।'

'বাধ্য হ'য়ে?'

'হ্যাঁ গো মশায়, দায়ে প'ড়ে। হ'লো? আমি মেয়েদের উলঙ্গ ছবি দেখতে-দেখতে তাদের শরীরের অ্যানাটমি মুখস্থ করি। বাড়ি গিয়ে খালি-গা হ'য়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে নিজের শরীরের সঙ্গে তাই মিলিয়ে দেখি। আমি যে আর্টিস্টের মডেল।'

মডেল কথাটার তো একটাই অর্থ আমার জানা ছিলো— আদর্শ। কিন্তু আর্টিস্টের মডেল, সে আবার কি বস্তু? এ তো এর আগে কখনো শুনি নি। একটু ভ্যাবাচাকা লেগে গেলো।

মেয়েটি তখন বুঝিয়ে বললেন, 'আপনাদের আর্টিস্টরা কিছু না দেখে মন থেকেই ছবি এঁকে যান। সে-ছবি আমি অনেক দেখেছি। কিন্তু

ইয়োরোপের আর্টিস্টরা সামনে একটা-কিছু না ধ'রে ছবির এক আঁচড়ও কাটতে পারেন না। তাই মানুষের ছবি আঁকতে গেলে একটা জ্যান্ত মানুষকে তাঁদের চোখের সামনে বসিয়ে রাখতে হয়। তারই নাম মডেল। যতোক্ষণ না ছবি শেষ হচ্ছে ততোক্ষণ আর্টিস্টের চোখের সামনে মডেলকে স্থির হ'য়ে ব'সে থাকতে হয়। নড়বার-চড়বার জো-টুকু নেই।'

'তাতে কষ্ট হয় না ?'

'গোড়ায়-গোড়ায় হয় বৈকি ? কিন্তু বসতে-বসতে শেষে অভ্যেস হ'য়ে যায়। তখন আর কষ্ট হয় না। কিন্তু আর না। সন্ধ্যে হ'য়ে এলো। এবার আমি উঠি।' —ব'লেই সঙ্গে-সঙ্গে সঙ্গিনী আমার উঠে দাঁড়ালেন। স্কার্টের উপর একবার হাত বুলিয়ে খাঁজখোঁজগুলো চোস্ত ক'রে নিলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, 'আসি এখন। গুড নাইট।'

আমি বললুম, 'এখুনিই যাবেন ? সন্ধ্যে হ'য়ে এলো বটে, কিন্তু এখনো তো রাত্তির পোহায় নি। এখানকার দরজা বন্ধ হ'য়ে এলেও অন্য অনেক দরজা খোলা পাওয়া যাবে। আমাদের কবি বলেছেন, তুমি যেয়ো না এখনি, এখনো আছে রজনী।'

'বাঃ! আপনাদের কবি তো বেশ বলেন। সুদূরের পিয়াসী— এখনো আছে রজনী। বাঃ! বেশ! কিন্তু আপনাকে হঠাৎ কাব্যে পেলো কেন, বলুন তো ?'

'দেখুন, কাব্যলক্ষ্মীর ছোঁয়া তো হঠাৎ-ই লাগে। তারপর কাব্য যে সহজেই কণ্ঠে এসে ভর করে। আমাদের দেশের অতো বড়ো এক রসকসহীন ফিলজফর শংকরাচার্য— তাঁর গায়ে একবার কাব্যলক্ষ্মীর ছোঁয়াচ লাগায় তাঁরও কণ্ঠ থেকে আনন্দলহরীর মতো অমন এক অপূর্ব কাব্য সহজেই বেরিয়ে এসেছিলো।'

'আপনার চোখ ছেড়ে শুধু দেহটা দেখলে মনে হয়, আপনিও বড়ো কম কাঠখোট্টা নন মশায়।'

কথা বলতে-বলতে আমরা ছ-জনে ন্যাশনল গ্যালারি থেকে বেরিয়ে পড়লুম। আস্তে-আস্তে ট্র্যাফালগার স্কয়্যারও পার হলুম। বাস্‌স্ট্যাণ্ডের দিকে যেতে-যেতে আমি বললুম, 'আর বোধ হয় আপনার দেখা পাওয়ার সৌভাগ্য হবে না?'

'খুব সম্ভব না। লণ্ডন শহর এতো বড়ো যে, এখানে একবার কাউকে হারালে তাকে আর খুঁজে পাওয়া দায়। আবার এ-ও শোনা গেছে পৃথিবী এতো ছোটো জায়গা যে, একদিন-না-একদিন আবার দেখা হবেই হবে।'

বাস্ এসে গেলো। বাসে ওঠবার আগে কি মনে ক'রে জানি নে, মেয়েটি প্রায় আমার কানে-কানে বললেন, 'যদি প্রেম করবার চেষ্টা না করেন, তা হ'লে কাল রাত্তির আটটায়। লেস্‌টার স্কয়্যারের হিপোড্রোমের সামনে।'

'ডিনার?'

'আচ্ছা, ডিনার।'

সমস্ত শরীরটাকে একটা ছন্দের দোলায় দুলিয়ে মেয়েটি এমন অনায়াসে বাসে লাফিয়ে পড়লেন যে, সেদিন প্রথম আবিষ্কার করলুম, কালিদাসের সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব উপমার সত্যিকার মানে কি।

মনটা অকারণে কিরকম পুলকিত হ'য়ে উঠলো। আগে যা কখনো করি নি, তাই করলুম। শিস দিতে-দিতে বাড়ির দিকে চললুম।

বাড়ি ফিরে দেখি, নীল খামে টমাস কুক-এর চিঠি এসে গেছে। সুখবর। এ-মাসের অ্যালাওয়েন্সটা আগেই এসে পড়েছে। মনটা আরো-খানিক প্রফুল্ল হ'য়ে উঠলো।

পরদিন দিনের বেলায় মন দিয়ে কোনো কাজ করতে পারা গেলো না। কেবলই ঘড়ি দেখছি, কখন সন্ধ্যে হয়। সন্ধ্যে হ'তেই কাপড় ছেড়ে সাফ-সোফ হ'তে ব'সে গেলুম। কিন্তু কিছুতেই আর মনঃপূত হয় না। চুলটা বুঝি ঠিক বুরুশ করা হয় নি। টাইটা একটু বেঁকে আছে না? জুতোজোড়াটায় আর-একটু পালিশ দরকার। বুকপকেটে সিল্কের রুমালটা যতোটা বেরিয়ে থাকা উচিত, ঠিক ততোটা বোধ হয় নেই।

অদল-বদল করতে-করতেই সাতটা বেজে গেলো। আর দেরি করা চলে না। একটু আগেই পৌঁছনো ভালো। বেরিয়ে পড়লুম।

ইলেকট্রিক ট্রেন যে অতো শিগ্‌গির গ্লস্টর রোড থেকে লেস্টর স্কুয়্যারে পৌঁছে দেবে, সেটা ধারণা করতে পারি নি। টিউব থেকে বেরিয়ে এসে হিপোড্রোমের সামনে ঘুরঘুর করতে লাগলুম।

এক-জায়গায় স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি নে। ভাবি, লোকে কি মনে করবে। পরে জেনেছিলুম, বৃথা আশঙ্কা। গোলাপ রায় বলেছিলেন, ইংরেজরা ও-সবে আদবেই মনোযোগ করেন না। তাঁদের কিছুই মনে হয় না। কিন্তু তখন ইচ্ছে হচ্ছিলো, একটা টিকিট কিনে হিপোড্রোমের লবিতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ব'সে পড়ি। পরমুহূর্তেই মনে হয়, না থাক। যদি মেয়েটি এসে আমাকে না দেখতে পেয়ে ফিরে যান!

হিপোড্রোমেরই চারপাশে ঘুরতে লাগলুম। বেশি দূরে যেতে মন সরে না, ভয় হয়। আটটা বেজে গেছে। সাড়ে আটটা গেলো। ঘড়িতে পৌনে ন'টা। মনে হ'তে লাগলো, পৃথিবীতে যতো রকমের শাস্তি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো শাস্তি— এই এলো, ওই এলো ক'রে-ক'রে কারুর জন্যে অপেক্ষা করা।

অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ক'রে কোনো পুরুষমানুষ যদি ঠিক সময় উপস্থিত

না হন, তা হ'লে বিলিতি শাস্ত্র-অনুসারে ভদ্রসমাজ থেকে তখুনি তাঁর নাম কাটা যায়। কিন্তু মেয়েদের বেলায় সাত খুন মাফ। তাঁদের জন্যে ঠিক কতোক্ষণ অপেক্ষা ক'রে যে চ'লে যাওয়া যেতে পারে, তার নির্দেশ তো কোনো শাস্ত্রেই পাওয়া যায় না।

তাই, এ-ক্ষেত্রে কি করা উচিত না-উচিত ঠিক স্থির ক'রে উঠতে পারলুম না। এর পরেও শিখে নিতে পারি নি। কারণ, এইরকম অপেক্ষা করা আমার এই প্রথম, আর এই শেষ। জানি, কথাটা কেউ বিশ্বাস করবেন না। সে যা-ই হোক, হিপোড্রোমকে কেন্দ্র ক'রে চরকির মতো ঘুরতে লাগলুম। যাই-যাই ক'রেও শেষপর্যন্ত বাড়ি ফিরে যেতে পারলুম না।

ঘড়িতে যখন কাঁটায়-কাঁটায় ন'টা তখন দেখি, মেয়েটি বাস্ থেকে নেমে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। কাছে এসেই হাত বাড়িয়ে দিলেন। দেরির জন্যে কোনোরকম কৈফিয়ত দেওয়া নেই, কোনো আফসোস প্রকাশ নেই। যেন ঠিক সময়েই এসে পৌঁছেছেন।

কোনো ভূমিকা না ক'রেই তিনি বললেন, 'আপনার বোধ হয় ইচ্ছে, আমাকে রিট্‌জ কি স্যাভয় কি মিলান-এ খেতে নিয়ে যাবেন। কিন্তু আপনি যে পোশাক প'রে এসেছেন, তাতে ওর কোনোটাতেই তো যাওয়া চলে না। চলুন আমার সঙ্গে সোহোতে।'

চললুম। ঠিক মেরীর মেষশিশুর মতোই মেয়েটিকে অনুসরণ ক'রে। যেতে-যেতে তিনি বললেন, 'মনে রাখবেন, আমার নাম আয়লা স্যাণ্ডহাম।'

আমি বললুম, 'ভুলবো না।'

'না ভোলাই ভালো। কেন না, ওটা আমার সত্যিকার নাম।'

'সত্যিকার নাম?'

'হ্যাঁ। আমাদের কাজের খাতিরে পুরুষদের সঙ্গে একটু খোলাখুলি-ভাবেই মিশতে হয়। তাই এক-এক জনের কাছে আমাদের এক-এক রকমের নাম।'

আমি তখনো অতো-শতো জানি নে। তাই ঠিক জবাব খুঁজে না পেয়ে বললুম, 'আমার নাম তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু ইংরেজদের এমনই বদস্বভাব যে, বিদেশীদের নাম তাঁরা বিকৃত করবেনই করবেন। সুতরাং আপনাদের মুখে আমার পদবী— চ্যাটার্জি।'

'ভাগ্যিস ব'লে দিলেন। নইলে আপনার পদবীকে আমি আরো কতোটা যে বদখত্ ক'রে উচ্চারণ করতুম, তা শুনে আপনার মনে নিশ্চয়ই পুলকসঞ্চার হ'তো না।'

সোহোতে পৌছনো গেলো। সোহো হচ্ছে লেস্টর স্কুয়্যারেরই পিছনের অলি-গলি অঞ্চল নিয়ে এক পল্লী। সেখানে বেশির ভাগ বিদেশী লোকের বাস। অধিকাংশ রেস্তোরাঁই ইটালিয়ন, ফরাসিস কি গ্রীক।

আমার সঙ্গিনী এক ইটালিয়ন রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়ে ওঠালেন। দেখলুম, সেখানে তাঁর খাতির আছে। ঢোকবামাত্র এক মোটাসোটা গোলগাল ব্যক্তি এগিয়ে এসে দেহটাকে আধ-হাত নিচু ক'রে আয়লা স্যাণ্ডহামকে কুর্নিশ করলেন। পরে জেনেছিলুম, উনিই রেস্তোরাঁর মালিক।

অধিকারীমশায় আমাদের এক কোনার টেবিলে নিয়ে গিয়ে একটা চেয়ার টেনে ধরলেন। তারপর ছোটো-গোছের আর-একটা সংক্ষিপ্ত কুর্নিশ। তার অর্থ, ম্যাডাম যেন দয়া ক'রে আসন গ্রহণ করেন।

আয়লা তাঁর কোটটা খুলে অধিকারীর হাতে ছুঁড়ে দিয়ে চেয়ার নিলেন। শাস্ত্রমতে কোটটা আমারই খুলে দেওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু

অতোদিন লণ্ডনে বাস ক'রেও এটিকেটত্বরস্ত হ'য়ে উঠতে পারি নি। অধিকারী মেমসাহেবের চেয়ারের পিঠেই তাঁর কোটটা ঝুলিয়ে রেখে দিলেন।

তারপর আর-একটা বাও। অস্থার্থ : ম্যাডাম কি খাবেন, ফরমাস করুন। আয়লা স্যাণ্ডহ্যাম বললেন, 'আমার বন্ধুটি ভারতবর্ষের লোক। আমাদের খাবার-দাবারের ভালো-মন্দ কিছুই বোঝেন না। আমিই ওঁর হ'য়ে অর্ডার দিচ্ছি— রাশান কাভিয়ার, অয়স্টার স্যুপ, চিক্‌ন ফ্রিকাসি আর পীচ্ মেল্‌বা। কেমন, ভালো হ'লো না?'

আর-একপ্রস্থ বাও ক'রে অধিকারী বললেন, 'ম্যাডামের রুচি একেবারে নিখুঁত।'

ম্যাডাম বললেন, 'আর ছাখো, একটা হাফ্‌বোতল স্পার্কলিং বারগ্যাণ্ডি।'

অধিকারী ঐকগাল হেসে বললেন, 'বহুত আচ্ছা, ম্যাডাম।'

অধিকারী চ'লে গেলে আয়লা স্যাণ্ডহ্যামকে ভালো ক'রে দেখবার ফুরসত পাওয়া গেলো। তাঁর পরনে নিচু ক'রে কাটা গলাখোলা হাতা-হীন একটা কালো স্যাটিনের ফ্রক। দেখে মনে হয় যেন আজই কেনা। এমনই সেটা ধোপদোরস্ত। কোথাও কোনো অলংকার নেই। কেবল কোমরের শ্যাসের সঙ্গে কৌশলে আটকানো একটা ঘোর লাল রঙের ফুটন্ত গোলাপ। চট ক'রে এক সংস্কৃত বয়েত মনে প'ড়ে গেলো। তার বাংলা অর্থ, রূপের অধিকারিণী যিনি, অলংকারে তাঁর আর কি হবে? সত্যি, রূপ থাকলে রূপটানের কি দরকার?

এবার ঘরটার দিকে চাইবার অবকাশ পাওয়া গেলো। বাইরের থেকে কোনো জল-জৌলুস চাকচিক্য নেই। কিন্তু ভিতরটা ছোটোখাটো হ'লেও বেশ আরামের জায়গা। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, গুছনো-গাছানো।

জোরালো বাতিগুলো সব নেভানো। টেবিলের উপর দুটো ক'রে ছোটো-ছোটো দস্তার ইলেকট্রিক ল্যাম্প। মাথাটা গোলাপী শেডে ঢাকা। ক্ষীণ আভা। অন্তরালে ব'সে কে-একজন খুব নরম সুরে বেহালা বাজাচ্ছে। কোথাও একটুকুও উগ্রভাব নেই। সবই স্নিগ্ধ সংযত।

লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, ইয়োরোপের কোথাও খাওয়া জিনিসটা একটা পেট-ভরানোর ব্যাপার নয়। খাওয়ার বিষয়ে মানুষ স্বভাবের কাছে হার মেনেছে। তাই খাওয়ার মধ্যে কেমন যেন একটা জন্তু-জন্তু ভাব চিরকালই র'য়ে গেছে। সেটার কদর্যতা যাতে সহজে চোখে না পড়ে, তার জন্যে ইয়োরোপে কতোই না চেষ্টা। খাবার টেবিল সাজায় ফুল দিয়ে। রুপোর কাঁচের চিনেমাটির ভালো-ভালো পান-আহারের পাত্র বের করে। খায়ও দু-ঘণ্টা ধ'রে গল্পগুজব করতে-করতে। নিজের ঘরের কোণে ব'সে একলা-একলা খাওয়াটা ইয়োরোপীয়নদের কাছে একটা দণ্ডবিশেষ।

কাভিয়ার এলো। জিনিসটা অন্য কিছু না; আমাদের দেশে যাকে বলি ইলিশ মাছের ডিম, তাই আর-কি। নামেই যা কাভিয়ার। তবে বেশ বাহার ক'রে টোস্টের উপর সাজানো। কাভিয়ার শেষ হ'তে স্যুপ এলো। স্যুপটা চিরকালই আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি নে। ওটাকে এক মস্ত ফাঁকি ব'লে মনে হয়। যেন জল দিয়ে পেট ভরাবার ফন্দি। পেট ভারী হ'য়ে থাকে ব'লে ওর পর ভালো-ভালো জিনিসগুলো আর বেশি ক'রে খাওয়াই যায় না।

-

ওয়েটর এসে বারগ্যাণ্ডির বোতল খুলে আয়লার গ্লাস ভর্তি ক'রে আমার গ্লাসে ঢালতে যাচ্ছিলো। আমি মানা করলুম। আয়লা হেসে বললেন, 'আপনি ও-সব খান না, একরকম ভালোই। সারাজীবন কিন্তু পস্তাতে থাকবেন। কেবলই ভাববেন, একবার খেয়ে দেখলে হ'তো

জিনিসটা কি।' —এই ব'লে বারগ্যাণ্ডির গ্লাসটা উঁচু ক'রে তুলে ধ'রে আমার সৌভাগ্যকামনা করলেন। আমি কি আর করি? জলের গ্লাসটাই উঠিয়ে তাঁকে শুভকামনা জানালুম।

মদ যাঁরা খান না, তাঁদের বোধ হয় মদের গন্ধেই নেশা হয়। নইলে, সেদিন আমার মনটা অতো খুলে যাবার যে কি কারণ ছিলো, তা তো বুঝি নে। হঠাৎ এমন স্ফূর্তি বোধ হ'তে লাগলো যে, আমি খেতে-খেতে কবিতা আওড়াতে লাগলুম। শেলী কীটস বায়রন টেনিসন থেকে বাছা-বাছা কবিতা। এখনকার কালে এ-সব কবির কাব্য আর চলে না। কিন্তু তখনকার দিনে এঁদের কবিতা আমাদের অনেকেরই মুখস্থ ছিলো।

আয়লা স্যাণ্ডহাম খানিকক্ষণ মনোযোগ দিয়ে আমার আবৃত্তি শুনে বললেন, 'আপনি কবিতা পড়েন তো মন্দ না। কিন্তু দেখুন, ওই প্রেম-ট্রেমের কথাগুলো আপনাদের মুখে একেবারেই মানায় না। ওগুলো রেখে দিন ফচ্‌কে ইংরেজ ছোঁড়াগুলোর জন্যে। যদিও ম'রে গেলেও তারা কেউ একছত্র কবিতা কবিতার মতো ক'রে পড়তে পারে না।'

আমি চুপ ক'রে গেলুম। মনের অবস্থা হ'লো ঠিক সেইরকম যে-রকম ঘটেছিলো একবার প্যারিসে, এর কিছুদিন আগে। ফ্রেঞ্চের প্রথমভাগ শেষ ক'রে মনে হয়েছিলো, ফ্রেঞ্চ বেশ গুছিয়ে বলতে পারবো। প্যারিসে একদিন রাস্তা হারিয়ে এক ভদ্রলোককে পথের হদিশ জিগ্যেস করলুম। মহা-উৎসাহে ফ্রেঞ্চ ব'লে যাচ্ছি, লোকটিও স্থির হ'য়ে শুনে যাচ্ছেন। খানিক পরে ভদ্রলোকটি অতিশয় বিনয়-সহকারে ইংরিজিতেই বললেন, 'মঁসিয়, আপনার ফ্রেঞ্চ অতিশয় উঁচু-দরের, অতি উৎকৃষ্ট, অতি মধুর। কিন্তু আমার নিতান্ত দুর্ভাগ্যবশত আমি তার একবর্ণও বুঝতে পারলুম না। আপনি ইংরিজিতেই বলুন। আমি কিছু-কিছু ইংরিজি জানি।'

আয়লা স্যাণ্ডহাম আমার মুখের দিকে চেয়ে যেন একটু সান্ত্বনাচ্ছলেই বললেন, 'তার চেয়ে শুনুন, আমি একটা গল্প বলি।'

এক-চুমুক বারগ্যাণ্ডিতে গলা ভিজিয়ে নিয়ে তিনি শুরু করলেন :

'হার্টফোর্ডসায়ারের সেণ্ট অল্‌ব্যান্স-এ এক-সময় এক পাদরি বাস করতেন। মা-মরা দুটি মেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার। গরিবের ঘর। ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। পৃথিবীতে সবচেয়ে করুণ আর সেই সঙ্গে সবচেয়ে হাস্যাস্পদ ব্যাপার যখন গরিবকে ভদ্রলোক সাজতে হয়।

'বড়ো মেয়েটি নিজের ভাগ্যের সঙ্গে নিজেকে একরকম খাপ খাইয়ে নিয়েছিলো। কিন্তু ছোটো মেয়েটার সেই দৈন্যের সংসারে কিছুতেই মন বসে না। সে চায় ভালো খেতে, ভালো পরতে, ভালো ক'রে সাজতে-গুজতে। পাদরিসাহেব সে-সব জোগাতে পারেন না। তবে মেয়েদের তিনি দস্তুরমতো ভালো ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে-লেখাপড়া কোনো কাজের নয়। তাতে এক পয়সাও আমদানি হয় না।

'মেয়েরা বড়ো হ'য়ে উঠেছে। একদিন পাশের জমিদারবাড়িতে কি-একটা উৎসব উপলক্ষে পার্টি। পাদরি আর তাঁর মেয়েদেরও সেখানে নেমন্তন্ন। ছোটো মেয়েটি কিছুতেই যেতে চায় না। তার লেশের পেটিকোটের জায়গায় ফ্ল্যানেলের পেটিকোট। সিল্কের মোজার বদলে সুতির মোজা। স্যাটিনের ফ্রকের বদলে সার্জের ফ্রক। ভেলভেটের জুতোর বদলে মোটা চামড়ার জুতো। কি ক'রে যায় বলুন তো? অথচ, জমিদারবাড়ির কাণ্ডকারখানা দেখবার জন্যে তার মন ছুঁকছুঁক করছে।

'শেষে গেলো। লোভ-সংবরণ করতে পারলে না। না-গেলেই কিন্তু ভালো করতো। সেই যে গেলো, মেয়েটি আর বাড়ি ফিরলো না। পার্টিতে গিয়ে সেখানকার হাবভাব চালচলন দেখে সে এমনই অপ্রকৃতিস্থ

হ'য়ে পড়লো যে, সেখান থেকে সোজা চ'লে গেলো স্টেশনে। শেষ-রাত্রের ট্রেন ধ'রে লণ্ডনে পালিয়ে চললো। একবারও ভাবলো না, কি হবে, কি করবে, কি ক'রে তার দিন চলবে। তখন সে এমনই উন্মত্ত।

'লণ্ডনে এসে গোড়ায়-গোড়ায় কী কষ্টে যে মেয়েটিকে দিনপাত করতে হয়েছিলো তার বর্ণনা দিয়ে আজকের পার্টিটা আর মাটি করতে চাই নে।

'লণ্ডনে থাকতে-থাকতে একটা ক্রশ-ওয়র্ড পাজ্‌ল ঠিক মতো সল্‌ভ ক'রে মেয়েটি পঞ্চাশ পাউণ্ডের একটা প্রাইজ পেয়ে গেলো। প্রাইজ-এর টাকাটা হাতে পেয়ে সর্বপ্রথম সে চ'লে গেলো এক পাবলিক বাথ-এ স্নান করতে। গরম জলে তিনঘণ্টা ধ'রে সুগন্ধি সাবান আর গন্ধদ্রব্য মেখে স্নান করতে কি যে আরাম, তা বোধ হয় আপনারা জানেন না। শুনেছি, আপনারা নাকি রোজই স্নান করেন। দরকার হ'লে দু-তিন বারও। আমাদের কাছে স্নানটা যে কতো বড়ো লাকসারি তা আপনারা বুঝবেন না।

'স্নান সেরে মেয়েটি বণ্ড স্ট্রীটের এক বিখ্যাত হেয়ারড্রেসারের দোকানে গেলো। সেখান থেকে এমন কায়দায় চুল ছেঁটে বেরিয়ে এলো যে, তাকে আর চেনা যায় না। তারপর একে-একে সমস্ত সাজ-পোশাক বদ্‌লে ফেললে। জুতো থেকে টুপি তক্— সব। গায়ের চামড়ার ঠিক উপর পশমের চেয়ে সিল্কের আণ্ডারওয়্যার কতো যে বেশি সুখকর, তা পুরুষমানুষদের বোঝাতে পারা শক্ত।

'মেয়েটার দোষ দেওয়া যায় না। বরাবর ঝলঝলে রেডিমেড পোশাক পরবার পর মাপ নিয়ে তৈরি করা লাগসই কাপড়চোপড় পেলে কে না খুশি হয়? তবু তো ইংরেজ-মেয়েরা ফরাসি মেয়েদের মতো কাপড় পরার আর্টটা এখনো ভালো ক'রে রপ্ত করতে পারে নি।

'হাতে সামান্য যা পয়সা বাঁচলো, তাই দিয়ে মেয়েটি এক নামজাদা হোটেলে একসপ্তার জন্যে ঘরভাড়া নিলো। সেখানকার পাখির পালকে তৈরি নরম বিছানায় শুয়ে শাদা ধবধবে লিনেন-এর বেড্ক্লোদস গায়ে জড়িয়ে মেয়েটি অনেক দিন পরে ভালো ক'রে ঘুমিয়ে বাঁচলো। ঘুম ভাঙলেও বিছানা ছেড়ে উঠতে চায় না। আলসেমি ক'রে আয়েসে চোখ বুঁজে বিছানায় প'ড়ে থাকে। বিছানায় শুয়ে-শুয়েই সে ব্রেকফাস্ট খায়।

'ঠিক সাত দিন এইভাবে চললো। তারপর সব চুকিয়ে-বুকিয়ে যখন সে হোটেল থেকে বেরুলো তখন তার হাতে দশ শিলিং তিন পেনি মাত্র অবশিষ্ট আছে।

'আবার সেই একঘেয়ে দুঃখের দিন। খাবার নেই, কিন্তু এবার কাপড় আছে। তাতেই মেয়েটা সুখী। যা পোশাক কিনেছিলো তার একটাও প্রাণ ধ'রে বিক্রি করতে পারে নি। দারুণ কষ্টেও সেগুলোকে আঁকড়ে ধ'রে রেখেছিলো।

'বেশ কিছুকাল ওই রকম চলার পর মেয়েটি কাজ পেয়ে গেলো। চাকরি নয়। বাঁধাধরা রুটিন মতো চাকরি সে করতেই পারতো না। আমার মতো সে-ও আর্টিস্টের মডেল হ'লো।'

আমি রসভঙ্গ ক'রে ফস্ ক'রে ব'লে ফেললুম, 'আমি সে-মেয়েটিকে চিনি।'

আয়লা স্যাণ্ডহাম ভুরু দুটো কপালে তুলে বললেন, 'সে আবার কি? আপনি চেনেন? কখনোই না।'

উত্তরে আমি একটা বাংলা গানের এক লাইন গাইতে উদ্যত হ'য়ে সামলে গেলুম। গাইলে নিশ্চয়ই কেলেঙ্কারি ঘটতো। তাই তার ইংরিজি তর্জমাটা শুধু মুখে আওড়ালুম। গানটা— আমি চিনি গো চিনি তোমারে, ওগো বিদেশিনি!

আয়লা স্যাণ্ডহ্যাম ধমক লাগালেন, 'আবার আরম্ভ করলেন ?'

তখন খাওয়া শেষ হ'য়ে গেছে। কফি এসেছে। কফির পেয়ালায় একটু গোল্‌ডেন শাতুর্জ লিকিওর ঢেলে আয়লা সেটা এক-চুমুকে পান ক'রে বললেন, 'দয়া ক'রে ও-সব থামান।'

কিন্তু তখন আমায় থামায় কে? আগেই অসাবধানে দু-চারবার আলগোছে হাতে হাত লেগে গেছে। টেবিলের তলায় দু-বার পা ঠোকাঠুকিও হ'য়ে গেছে। নেশা মাথায় চড়েছে। আমি গানটা আগাগোড়া আবৃত্তি ক'রে চললুম।

আবৃত্তি শেষ হ'তে-না-হ'তেই আয়লা স্যাণ্ডহ্যাম চেয়ার ছেড়ে উঠে দরজার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আরে, আমার স্বামী দেখছি যে আমার সন্ধানে-সন্ধানে এখানেই এসে হাজির হয়েছেন। চলি।' —ব'লে দরজার দিকে তরতর ক'রে এগিয়ে গেলেন। যাবার সময় কোটটা চেয়ারের পিঠ থেকে তুলে নিতে ভুললেন না।

দরজাটা আমার পিছনে পড়ে। আমি ঘাড় বেঁকিয়ে দেখলুম, এক অতিশয় সুপুরুষ ব্যক্তি দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে। আয়লা তাঁরই সঙ্গে ধাঁ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

ঝাঁ ক'রে আমার নেশা কেটে গেলো। ওয়েটার এসে বললে, 'একটা হাফ্‌ বোতল বারগ্যাণ্ডি এনে দেবো কি সার্‌ ?'

আমি তাকে তেড়ে গেলুম। কটুস্বরে হাঁকলুম, 'বিল লেয়াও।'

বিল এলো। দাম উঠেছে পাঁচ পাউণ্ড! আমার একমাসের অ্যালাওয়েন্স-এর সিকিটা একরাত্তিরেই উবে গেলো। বিল চুকিয়ে দিলুম। ওয়েটারকেও তার ন্যায্য প্রাপ্য দশ শিলিং বকশিশ দিতে হ'লো। হেঁটেই বাড়ি চললুম। বাস্‌ নিলুম না। ট্রেনেও চাপলুম না। তবু তো তিনটে পেনি সাশ্রয় হ'লো।

কিছুদিন পরে, একদিন সার্ উইলিয়ম রোটেনস্টাইনের বাড়ি গিয়েছি। গুরুদেবের খাতিরে সেখানে আমাদের অবারিত দ্বার। শুনলুম, তিনি স্টুডিওতে আছেন। দরজায় হাল্কা একটা টোকা মেরে পা টিপে-টিপে স্টুডিওতে ঢুকলুম। দেখি, রোটেনস্টাইন ঘাড় নিচু ক'রে ছবি এঁকে চলেছেন। তাঁর সামনে এক প্ল্যাটফর্মের উপর একটা উঁচু টুলে ব'সে আয়লা স্যাণ্ডহাম! গায়ের কোথাও কোনো আবরণ নেই। চোখের পলক পড়ছে না। স্থির পাষাণ-মূর্তি। যেন স্বপ্ন দিয়ে তৈরি।

আধ-ঘণ্টা পরে রোটেনস্টাইনের কাজ সাঙ্গ হ'লো। ঘরের এক কোণের পর্দা সরিয়ে আয়লা স্যাণ্ডহাম কাপড় পরতে গেলেন। মিনিট পাঁচ পরে বেশভূষা ক'রে বেরিয়ে এলে রোটেনস্টাইন আমাদের ইনট্রোডিউস করলেন— 'মিস গ্রেস কুপার, মিস্টার চ্যাটার্জি।'

আমি রোটেনস্টাইনের মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে তাকিয়ে বললুম, 'মিস··· ?'

রোটেনস্টাইন ফের বললেন, 'মিস গ্রেস কুপার।'

আয়লা স্যাণ্ডহাম ততোক্ষণে দরজা খুলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেছেন।

তারপর আর কখনো আয়লা স্যাণ্ডহামকে চোখে দেখি নি। তবে, দ্বিতীয় বার বিলেতে থাকবার সময় একদিন, ঠিক মনে পড়ছে না কার পাল্লায় প'ড়ে একবার এক এগ্‌জিবিশন দেখতে গিয়েছিলুম। বিখ্যাত আর্টিস্ট অগাস্টস জন্-এর আঁকা এক মেয়ের ছবির সামনে গিয়ে চমকে উঠলুম। মেয়েটির মুখ কি হুবহু আয়লা স্যাণ্ডহাম-এর মুখ!

এমব্যাঙ্কমেন্টের ধারে

অনেকের মতো আমারও ছেলেবয়েসে ধারণা ছিলো, ব্যারিস্টার হ'তে গেলে বুঝি খানা দিতে হয়। কিন্তু ব্যারিস্টার হ'তে গিয়ে দেখি, খানা দিতে হয় না, খানা খেতে হয়। এর থেকেই বোধ হয় ইংরেজ উকিলমহলে এক ঠাট্টা চ'লে এসেছে, ইটিং ইয়োর ল। শাদা বাংলায়, পেট দিয়ে আইন শেখা।

ব্যারিস্টার হ'তে গেলে সর্বপ্রথম যে-কোনো একটা ইন্-এ ভর্তি হ'য়ে নিতে হয়। লণ্ডনে চার-চারটে ইন্স-অভ্-কোর্ট আছে— লিংকন্স ইন্, গ্রেস ইন্, মিড্ল টেম্পল, ইনার্ টেম্পল। এক ফী নিয়ে সামান্য কিছু ইতরবিশেষ ছাড়া এই চার ইন্-এর মধ্যে আর বিশেষ-কিছু তফাত নেই। সব ক'টা ইন্-ই একভাবে ছাত্রদের বার্-এ কল্ ক'রে ব্যারিস্টার-অ্যাট-ল ডিগ্রি দেয়।

আগেকার কালে চারটে ইন্-এর মধ্যে বোধ হয় খানিকটে তারতম্য ছিলো। এ-সম্বন্ধে একটা ছড়া এখনো মাঝে-মাঝে শোনা যায়। ছড়াটার মর্ম হচ্ছে, ইনার্ টেম্পল বড়োলোকদের ইন্, মিড্ল টেম্পল গরিবদের, লিংকন্স ইন্ ভদ্রলোকদের, আর গ্রেস ইন্ চাষাভুষোদের।

সামান্য একটু সূক্ষ্ম বিচার এখনো আছে। অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের ছাত্ররা প্রায়ই ইনার্ টেম্পলে ভর্তি হন। যাঁরা কমন্ ল, বিশেষ ক'রে ফৌজদারি আইন প্র্যাকটিস করবেন, তাঁরা যান মিড্ল টেম্পল-এ। যাঁরা চানসারি ল, অর্থাৎ উইল ট্রাস্ট নাবালক দেউলে— এই সব নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করবেন, তাঁদের স্থান লিংকন্স ইন্-এ। আর, যাঁদের পয়সার

একটু টানাটানি, তাঁরা কিছু ফী বাঁচাবার জন্যে গ্রেস ইন্-এ গিয়ে জোটেন।

বাঙালী ছাত্রদের বেশির ভাগ যান মিড্‌ল টেম্পল-এ। এর কারণ, প্রথম দিশি ব্যারিস্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর মিড্‌ল টেম্পল-এ মানুষ। জ্ঞানেন্দ্রমোহন পাথুরেঘাটার বিখ্যাত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের একমাত্র পুত্রসন্তান। ক্রীশ্চানধর্ম গ্রহণ করায় প্রসন্নকুমার তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করেন।

প্রত্যেক ইন্-এ একটা ক'রে হল্ আছে। এই হল্-এ ব'সেই খানা খেতে হয়। মিড্‌ল টেম্পল-এর হল্ তখনকার দিনের সবচেয়ে পুরনো হল্ ছিলো। সেই হল্-এর দেয়ালের প্যানেল স্প্যানিশ আরমাডার জাহাজগুলোর কাঠ দিয়ে যে তৈরি, তার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। ইংলণ্ডের রানী কুইন এলিজাবেথ— প্রথম, দ্বিতীয় নন— এই হল্-এ ব'সেই একদা সেক্সপীয়র-এর 'টুয়েলভ্‌থ নাইট' নাটকের অভিনয় দেখেছিলেন। সে-কথা মিড্‌ল টেম্পল-এর দপ্তরখানার পুরনো নথিপত্তরে স্পষ্টাক্ষরে লেখা আছে। শুনেছি, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে এই হল্‌টা জার্মান বোমা খেয়ে নাকি একেবারে তছনছ হ'য়ে গেছে।

ইন্-এর হল্-এ ব'সে প্রত্যেক টার্মে ছ'দিন— ইউনিভার্সিটির পড়ুয়া হ'লে তিনদিন— ডিনার খেলে তবে একটি ক'রে টার্ম রাখা হ'লো। আর এইরকম বারোটা টার্ম না রাখলে, পরীক্ষায় হাজারো ভালো ক'রে পাস করলেও, ব্যারিস্টার পদবী পাওয়া যায় না। অর্থাৎ, নিয়ম মতো টার্ম না রাখলে কোনো ইন্-ই কোনো ছাত্রকে বার্-এ কল্ করবে না। লেকচারে একেবারে না গেলেও চলে। পারসেণ্টেজের কোনো কড়াক্কড়ি নেই। কিন্তু হল্-এ টার্ম-পিছু ছ'দিন ক'রে খানা না খেলে ইন্-এর বেঞ্চারদের দয়া ছাড়া আর-কিছুতেই কিছু ছাড়ান-ছোড়ন নেই।

ইন্-এ খাওয়ায় কিন্তু খুব ভালো। লাভের ফন্দি নেই ব'লে খাবার জিনিসগুলো অতি উৎকৃষ্ট, দামও খুব সস্তা। যে-ডিনার অন্যত্র দশ শিলিং-এর কমে কিছুতেই পাওয়া যায় না, সেই ডিনারই ইন্‌স-অভ্-কোর্টে খেতে তখন মাত্র আড়াই শিলিং লাগতো। তবে, ডিনার অত্যন্ত শাদাসিধে। পুরাকালের আসল ইংরিজি ধরনের খানা। উপকরণের বাহুল্য নেই বটে, কিন্তু খেতে সুস্বাদু আর পুষ্টিকরও বটে। একেবারে চোখ বুঁজে খাওয়া চলে। কোনোদিন একটুও অম্বল হবে না, গলাজ্বালা বুকজ্বালা করবে না, পেটও কামড়াবে না। পেট-ভ'রে খেলেও শরীর আইঢাই করবে না।

আবার পানীয়েরও ভালো বন্দোবস্ত আছে। খেতে-খেতে গলা ভিজোবার জন্যে জলের বদলে বিয়র। আর বিয়র যাঁরা ছোঁন না, তাঁদের দরুন জিন্‌জর বিয়র। যতো চাই ততো। আমাদের সঙ্গে একটি উত্তর-প্রদেশের ছাত্র ছিলেন। তিনি জিন্‌জর বিয়রকে সত্যি বিয়র মনে ক'রে গোড়ায়-গোড়ায় সেটাকে শতহস্ত দূরে রেখে চলতেন। পরে, জিনিসটা আসলে যে কি তা জানতে পেরে তা-ই চালাতেন গেলাস-গেলাস। তখন আর শাদা জলে তাঁর মন ওঠে না।

ইংরেজরা অবশ্য বিয়রকে মদ ব'লে গণ্য করেন না। মদের ব্যবস্থাও কিছু খারাপ না। ছাত্রদের টেবিলে চারজন ক'রে নিয়ে এক-একটা মেস্। যে-রাত্তিরে যিনি মেসের প্রধান হতেন, তাঁরই উপর মদের অর্ডার দেবার ভার পড়তো। এক বোতল ক্ল্যারেট কি শেরি কি পোর্ট প্রত্যেক মেস্-এর চারজনে ভাগ ক'রে নিয়ে খাওয়াই রীতি। এর জন্যে আলাদা দাম দিতে হ'তো না। ওই আড়াই শিলিং-এর মধ্যেই ধ'রে নেওয়া হ'তো। রসজ্ঞ যাঁরা, তাঁদের বলতে শুনেছি, এ-রকম ভালো মদ অন্যত্র কোথাও পাওয়া দুষ্কর। সে-সব মদ ইন্-এর সেলার-এ বহুদিন ধ'রে

বোতলভর্তি ক'রে ধ'রে রাখা। সে কি আজকের কথা? ষাট-সত্তর-আশি-নব্বই-একশো বছর ধ'রে মাটির নিচেকার অন্ধকার ঘরে তারা বোতলবন্দী হ'য়ে আছে।

ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে আমরা তিনজন সচরাচর একই মেস্-এ বসতুম। সতীশচন্দ্র বসু (শরৎ বসু, সুভাষ বসুর দাদা, আমাদেরও বড়দা), প্রকাশনারায়ণ সপ্রু, আর আমি। আমাদের মেস্-এর প্রধান হতেন উইলিয়ম বেট্স ব'লে এক ইংরেজ ছাত্র। বেট্স অমন ছাত্রই আছেন প্রায় গোটা দশ-বারো বছর। বয়েস ষাট পেরুবে-পেরুবে করছে। এগ্জামিন তাঁর কাছে বিভীষিকা। বোধ হয় ছেলেমেয়েদের অনুযোগ সহ্য করতে না পেরে তিনি এক-একবার পরীক্ষা দিতে আসতেন, কিন্তু প্রশ্নপত্রের উপর একবার আগাগোড়া চোখ বুলিয়েই চেয়ার ছেড়ে উঠে প'ড়ে হল্ থেকে বেরিয়ে যেতেন।

বেট্স দেখে-দেখে মধুরসে অনভিজ্ঞদের দলে মেস্ করতেন। তাতে সুবিধে এই, মদের বোতলের সবটাই তাঁর একার ভোগে আসতো। তাই আমাদের ছেড়ে বেট্স কদাচ অন্যত্র মেস্ করতে যেতেন না। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, পাঁচ-ছ পাত্র বিয়রের পর, পুরো এক বোতল পোর্ট (অন্য মদে বেট্স-এর তেমন আসক্তি ছিলো না) টেনেও বেট্স-এর একটুও পা টলতো না, কথা একটুকুও জড়িয়ে যেতো না। শুধু তাঁর মুখটা ফিকে গোলাপী থেকে ক্রমে-ক্রমে সিঁদুরে লাল আভা ধারণ করতো।

বড়ো অদ্ভুত জায়গা এই ইন্গুলো। দেখলেই মনে হ'তো কেউ যেন বহুযুগের ওপার থেকে অতীতকালের শহরের এক-টুকরো মন্ত্রবলে উঠিয়ে এনে হাল-সনের লণ্ডন শহরের একেবারে বুকের উপর তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে গেছে। শহরের বিষম হট্টগোলের হাত এড়িয়ে, অতি মনোরম কয়েকটি আর্চওয়ালা গেট পেরিয়ে ইন্গুলোর মধ্যে ঢুকলেই মনে হ'তো

যেন ফুসমন্তরের চোটে বিশ শতাব্দী থেকে একেবারে মধ্যযুগে উড়ে যাওয়া গেলো।

সেখানকার সব-কিছুতেই পুরাকালের গন্ধ। বাড়িঘর চ্যাপ্‌ল চিমনি ম্যান্ট্‌লপিস ফায়ারপ্লেস ডাইনিং-হল্‌ দরজা-জানলা ছাত সিঁড়ি— সবই তেরো-শো চোদ্দ-শো শতাব্দী থেকে শুরু। এমন কি, আসবাবপত্র হল্‌-এর খাবার টেবিল-চেয়ার রুপোর বাসন-কোসন একসঙ্গে মদ খাবার চাঁদির লাভিংকাপ ছবি ঝাড়-লণ্ঠন— সে-সব যে কতোদিন ধ'রে সংগ্রহ করা, তা কে জানে? কতো শতাব্দীর-পর-শতাব্দীর ছাপ তাদের উপর। এ-কালের ইলেকট্রিসিটি কলের জল ড্রেন ইত্যাদি আছে বটে, কিন্তু তারা যেন লজ্জায় অন্তরালে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। সহজে চোখে পড়ে না। ইন্‌-এর কর্তৃপক্ষ হঠাৎ নতুন-কিছু করার একেবারেই পক্ষপাতী নন।

সবচেয়ে অবাক কাণ্ড— পার্ক নয় গার্ডেন্স নয় স্কুয়্যার নয়— ইন্‌-এ ঢুকতেই ইটপাথরের বাড়ির অন্দরেই চোখজুড়োনো সবুজ ঘাসের লন্‌। তার পাড়ে ফুটে আছে কতো রকমের ফুল—লাল নীল শাদা হলদে বেগ্‌নি। বড়ো-বড়ো গাছগুলো কতোদিন ধ'রে একই জায়গায় স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে। শহরের বুকের মধ্যে পাখির ডাক। সব নিয়ে মনে হয়, ধুধু মরুভূমির থেকে হঠাৎ একটা ওয়াশিস-এ এসে পড়া গেলো।

তারই মধ্যে দিয়ে চলেছেন ব্যারিস্টাররা। তাঁদেরও পোশাক-আশাক সেই মধ্যযুগের। মাথায় ঘোড়ার বালামচি দিয়ে তৈরি পাউডার মাখানো শাদা-শাদা কোঁকড়া-কোঁকড়া পরচুলোর উইগ। গলায় লিলেনের দুটো শাদা ঝকঝকে ফাতনাওয়ালা ব্যাণ্ড। অঙ্গে জড়ানো পা পর্যন্ত লম্বা জোব্বার মতো কালো গাউন। কাঁধে ঝোলানো নীল কি লাল রঙের কাপড়ে তৈরি ব্রিফব্যাগ।

লণ্ডন শহরের যে-জায়গাটায় আমি থাকতুম সেখান থেকে আমাদের লিংকন্স ইন্-এ আসতে গেলে প্রথমে পেরোতে হয় মিড্ল টেম্পল। ইলেকট্রিক ট্রেনে চ'ড়ে টেম্পল স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটে একটুখানি এগিয়ে গেলেই মিড্ল টেম্পল-এর ফাউন্টেন কোর্ট পাওয়া যায়। পুরাকালের এক গেটের ভিতর দিয়ে ঢুকে তিন ধাপ সিঁড়ি বেয়ে সেখানে নামতে হয়। তারপর ওই কোর্টটা পেরিয়ে মিড্ল টেম্পল লেন। সেটা গিয়ে পড়েছে ফ্লিট স্ট্রীট-এ। ফ্লিট স্ট্রীট ক্রশ করলেই ও-পারে বেল্ ইয়ার্ড। তারই ভেতর দিয়ে দু-পা চ'লে গেলেই লিংকন্স ইন্।

মিড্ল টেম্পল-এ ঢোকবার মুখের সিঁড়ির গায়েই এক ব্যক্তিকে রোজ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখতুম। তার কাপড়চোপড় শতছিদ্র হ'লেও নোংরা নয়। জুতোজোড়া চকচকে ক'রে পালিশ-করা। লোকটার একমুখ দাড়িগোঁফ। চোখে নীল চশমা। হাতে একটা টিনের ট্রে। সেটা কাঁধের উপর দিয়ে ঝোলানো একটা চামড়ার স্ট্র্যাপে বাঁধা।

লোকটা কোনো কথা বলে না। দেশলাই-এর ট্রে-টা হাতে ধ'রে চুপ ক'রে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে। পথিকদের যার ইচ্ছে সে ওই ট্রের থেকে একবাক্স কি একপাত দেশলাই উঠিয়ে নিয়ে ট্রের উপরই দামের পয়সাটা ফেলে দেয়। তখন লোকটার মুখ দিয়ে কেবল একটা অস্পষ্ট শব্দ বেরোয়। সেটা বোধ হয় থ্যাংক ইউ-এর একটা আধো উচ্চারণ।

আমি তখনো সিগারেট ধরি নি। তবু ইন্-এ যাওয়া-আসার পথে ওই লোকটার কাছ থেকে প্রত্যহ একটা ক'রে দেশলাই কিনতুম। কোনো অনুরোধ নেই উপরোধ নেই, তবুও। লোকটার মুখে কেমন যেন মায়া মাখানো। কেন জানি না, মনে হ'তো তার ওই নীল কাঁচের চশমার ভিতর দিয়ে সে আমাদের সব্বাইকে বেশ ভালো ক'রে দেখে নিচ্ছে। আমরাই কেবল তার আদত চেহারাটা ধরতে পারছি নে।

অন্যদের কি মনে হ'তো জানি নে। কিন্তু দেখতুম, তাঁরাও আমার মতো রোজই দেশলাই কিনছেন। প্রয়োজনে, না আমার মতো অপ্রয়োজনে, সেটা আমি আর খোঁজ ক'রে দেখি নি। অথচ, লোকটাকে একদিনের তরেও কখনো কারুর সঙ্গে একটা কথা বলতে শুনি নি। শুধু ওই এক আধো-আধো থ্যাংক ইউ ছাড়া।

সেদিন রাত্তিরে আমাদের লিংকন্স ইন্-এর গ্রাণ্ড নাইট। বছরে চারটে টার্ম-এর প্রত্যেক টার্মেই একটা ক'রে গ্রাণ্ড নাইট। গ্রাণ্ড নাইটে খানাপিনার একটু বিশেষ আয়োজন। দু-এক পদ বেশি ডিস। খাওয়ার শেষে ফল-মেওয়া দেখানো হয়। আর পানীয়ের মধ্যে বাড়ার ভাগ এক বোতল শ্যাম্পেন।

খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজব হাসি-মস্করা সেরে উঠতে বেশ রাত্তির হ'য়ে গেলো। তবে লণ্ডন শহরের পক্ষে সে কিছুই নয়। সবে কলির সন্ধ্যে। আমার সঙ্গীরা হ্যামস্টেডে যাবেন। তাঁরা চান্সারি লেন দিয়ে ট্রেন ধরতে গেলেন। আমি যাবো উল্টোদিকে কেনসিংটনে। লিংকন্স ইন্ থেকে বেরিয়ে মিড্ল টেম্পল-এ ঢুকলুম। চারদিক থমথম করছে। নিজের পায়ের শব্দে নিজেই বারে-বারে চমকে উঠি।

মিড্ল টেম্পল পেরিয়ে বড়ো রাস্তায় পড়তে দেখি, মেঘ কেটে গিয়ে আকাশে একটু ফ্যাকাশে জোছনা ফুটেছে। তখুনি বাড়ি ফিরতে মন গেলো না। ভাবলুম, আগে একটু হেঁটে নিই। সামনেই টেম্স নদী। তার উপর পোস্তা গেঁথে পাথর-বাঁধানো এমব্যাঙ্কমেণ্ট। খানিকটা বেড়াবার পক্ষে মন্দ জায়গা নয়। খালের মতো সরু নদীর উপর ছোটো-ছোটো মোটর-লঞ্চ আর পানসিগুলো ফিকে জোছনার আলোয় বেশ দেখতে লাগছে। কিছুদূরে এক সাড়ে ছ'ফুট লম্বা পুলিশম্যান শরীর গরম রাখবার জন্যে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দু-হাতে ঝাঁকি মেরে তালি বাজাচ্ছে।

এমব্যাঙ্কমেণ্টের এ-মুড়ো থেকে সে-মুড়োয় বসবার জন্যে মাঝে-মাঝে বেঞ্চি পাতা আছে। যতো-সব যথাসর্বস্ব খোওয়া-যাওয়া গৃহহারা ব্যক্তি সেই বেঞ্চিতে ব'সে ঢুলে-ঢুলে রাত কাটায়। রোঁদের কন্স্টবলরা তাদের সবাইকে ভালোরকমই চেনে। গোলমাল না করলে কিছু বলে না।

ঘুরে-ঘুরে ক্লান্তি বোধ হওয়াতে আমি একটা বেঞ্চিতে ধুপ ক'রে ব'সে পড়লুম। প্রায় খালি বেঞ্চি। কেবল এককোণে এক ব্যক্তি ছেঁড়া ওভারকোটের গলাটা কান পর্যন্ত টেনে তুলে দিয়ে জড়োসড়ো হ'য়ে ব'সে।

বেঞ্চিতে ব'সে থাকতে-থাকতে মনে হ'লো, লোকটাকে আগে যেন কোথায় দেখেছি। প্রথমে কিছুতেই মনে পড়তে চায় না। তারপর স্মৃতিপথে হঠাৎ ঝিলিক মেরে গেলো, ঠিকই তো। এই লোকটাকেই তো রোজ মিড্ল টেম্পল-এর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে দেশলাই বেচতে দেখি। চোখে এখন নীল চশমা পরা নেই বটে, কিন্তু মুখভরা ঠিক সেই দাড়িগোঁফ, মাথায় সেই বহু পুরনো কাঠের মতো শক্ত বোলার্ হ্যাট। কিন্তু নিঃসন্দেহ হই কি ক'রে? শুনেছি, লণ্ডনে অপরিচিত লোকের সঙ্গে গায়ে প'ড়ে আলাপ করতে যাওয়াটা বড়ো নিরাপদ জিনিস নয়।

লোকটাকে ঠিকভাবে সনাক্ত করবার আগ্রহে মত্ত হ'য়ে আমি এক অতি অভদ্র কাজ ক'রে ফেললুম। একদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রইলুম। লোকটিও আমার দিকে বার-বার আড়চোখে চায়। কিন্তু কেউ কাউকে কিছু বলি না। এই রকম অসোয়াস্তিতে খানিকক্ষণ কাটবার পরে আমার সঙ্গীই আপনা হ'তে বললো, 'গুড ইভ্নিং সার্।' অতি চোস্ত ভদ্র গলা। শিক্ষাদীক্ষাওয়ালা লোকেরই মতো পরিষ্কার উচ্চারণ। আমি থতমত খেয়ে গিয়ে কোনোক্রমে উগরে ফেললুম, 'গুড ইভ্নিং।'

কথা শুরু হ'য়ে গেছে দেখে কন্‌স্টবলটা আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। কিন্তু কিছু বললো না। আমার সঙ্গীর দিকে একটু চোখ টেরিয়েই দূরে স'রে গেলো। বুঝলুম, কন্‌স্টবল ওকে নিতান্ত নিরীহ ভালো মানুষ ব'লে জানে। নয়তো বিদিশি লোক আমি, আমাকে সে ডেকে নিশ্চয়ই সাবধান ক'রে দিতো। এবার আমার পালা। এদিক-ওদিক না ক'রে আমি একেবারে সোজা জিগ্যেস ক'রে বসলুম, 'তোমাকেই কি রোজ-রোজ মিড্‌ল টেম্পল-এ ঢোকবার পথে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি ?'

লোকটা মুখে কিছু বললো না। পকেট থেকে একটা চশমা বের ক'রে চোখে লাগিয়ে নিলো। আরে, এ যে সেই নীল চশমাখানা! রাত্তিরের অন্ধকারে ঘোর কালো ব'লে মনে হচ্ছে। একটা রঙিন চশমায় মানুষের মুখের চেহারা কতোটা বদ্‌লে যেতে পারে আগে অতোটা জানা ছিলো না। চশমা পরতেই লোকটার সম্বন্ধে আর-একটুও সন্দেহ রইলো না। এ সেই মিড্‌ল টেম্পল-এর লোকই বটে।

এইবার লোকটি আমায় জিগ্যেস করলো, 'আপনার চেহারা দেখে আর আপনার কথা শুনে বোধ হচ্ছে, আপনি বিদিশি লোক। আপনি কি মিড্‌ল টেম্পল-এর ছাত্র ?' আমি বললুম, 'আমি বিদিশিও বটে, ছাত্রও বটে। তবে মিড্‌ল টেম্পল-এর নই, লিংকন্স ইন্-এর। বাড়ির থেকে আসতে গেলে টেম্পল স্টেশনে নামতে হয়। সেইজন্যে মিড্‌ল টেম্পল-এর ভিতর দিয়ে আমাকে যাওয়া-আসা করতে হয়। কিন্তু তোমার চেহারা দেখে যা-ই মনে হোক, তোমার কথা শুনে তো মনে হচ্ছে, তুমি আসলে দেশলাই বিক্রিওয়ালা মোটেই নও।'

লোকটা চুপ ক'রে রইলো। আমার মনে হ'তে লাগলো, তার মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলেছে— বলবো, কি বলবো না। আমরা দু-জনেই চুপ। রাত্তির

গভীর হয়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল দূরের এক বেঞ্চি থেকে কার একজনার নাক-ডাকার শব্দ তালে-তালে উঠছে-পড়ছে। অনেকক্ষণ স্থির থেকে আমার সঙ্গী বললো, 'আপনি কি ভেবে রেখেছেন জানি নে। কিন্তু আমি এক-সময় মিড্‌ল টেম্পল-এর ব্যারিস্টার ছিলুম।'

ব্যারিস্টার! শুনতে ভুল করলুম না তো? না, লোকটার কথা তো জলের মতো পরিষ্কার। আমাকে বিদিশি দেখে আজগুবি গল্প ওড়াচ্ছে না তো? না, তা-ও না। লোকটার চেহারা দেখে সে-রকম কিছু ব'লে তো মনে হয় না। নিশ্চয় এর মধ্যে কিছু রহস্য আছে। সেটা কি, তার সন্ধান নেবার জন্যে আমি লোকটির মুখের উপর ভালো ক'রে দৃষ্টিপাত করলুম। তার চোখে তখনো নীল চশমা আঁটা। কিছুই বোঝা গেলো না।

আমার মুখ বন্ধ, কিন্তু কান খাড়া। শুনলুম, লোকটি অতি শান্ত স্বরে বলছে, 'আমার কথাটা আপনাকে খুলে বলতে ইচ্ছে যাচ্ছে, কিন্তু সংকোচে বাধছে। অথচ কেন জানি না, আজ মনে হচ্ছে, কথাটা কাউকে ব'লে ফেলতে না পারলে আমার মনের ভার নামবে না। আপনাকে বললে তবু কিছুটা শান্তি পাবো ব'লে মনে হয়। নিজের দেশের লোকের কাছে কথাটা আমি কিছুতেই খুলে বলতে পারবো না।'

আমি সসম্ভ্রমে বললুম, 'যদি বলতে অন্য কোনো বাধা না থাকে, তা হ'লে আর দ্বিধা-সংকোচ করবেন না।' আমার চোখ-মুখ দিয়ে লোকটির কথা শোনবার আগ্রহ ফেটে পড়ছে।

সঙ্গী খুব নিচু গলায় ব'লে যেতে লাগলেন, 'আপনাকে বিশ্বাস ক'রেই কথাটা বলছি। কিন্তু তার আগে কথা দিন, আমার সম্বন্ধে কোনোরকম খোঁজখবর নেবার চেষ্টা করবেন না। আর আমার কথা শুনে একটুও সহানুভূতি প্রকাশ করবার চেষ্টা করবেন না। আমি কারুর কাছ থেকে

কোনোরকম করুণা চাই নে।' এইখানে লোকটির স্বর খুব কর্কশ হ'য়ে উঠলো। আমি কথা দিলুম।

লোকটি তখন বললেন, 'আমার এখনকার নাম রবার্ট ব্রাউন। কিন্তু এক-সময় আমার অন্য এক নাম ছিলো। সে-নাম আমাকে একেবারে ধুয়েমুছে উঠিয়ে ফেলতে হয়েছে। কারণ, এক-সময় খুনী আসামী হ'য়ে আমায় কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছিলো।'

খুনী আসামী! আমি চম্‌কে উঠলুম। এ যে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত। তবু মুখে কিছু বললুম না।

ব্রাউন ব'লে চললেন:

'আপনি অবাক হচ্ছেন। অবাক হবারই কথা। যে-স্ত্রীলোকটিকে খুন করার চার্জে প'ড়ে আমায় ডক্-এ চড়তে হয়েছিলো, তিনি আমার স্ত্রী। আমি তাঁকে সত্যিই খুন করি নি। কি ক'রে তাঁর মৃত্যু ঘটেছিলো লোকে না জানলেও, আমি জানি। আমার সঙ্গে বিবাহের পর জানা গেলো, আমার স্ত্রী অন্যের সন্তান তাঁর গর্ভে বহন করছেন। তাঁর সব কথা জেনে আমি তাঁকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা করেছিলুম। কিন্তু সে-ক্ষমা তিনি সহ্য করতে পারলেন না। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলেন।

'সমস্ত ঘটনাটা বিচারের সময় খুলে বলা সম্ভব হয় নি। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জুরী আমাকে নির্দোষ ব'লে রায় দিয়েছিলেন। সাম্‌আপ ক'রে জুরীকে কেসটা বুঝিয়ে দেবার সময় জজসাহেবও জুরীকে বেনিফিট অভ্ দ' ডাউট-এর তত্ত্বটা একটু যেন বেশি জোর দিয়েই বুঝিয়ে বলেছিলেন। আমি খালাস পেয়ে গেলুম।

'জেল থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখি, সব অন্ধকার। বাড়িওয়ালা নোটিস দিয়েছে, শিগ্‌গিরই যেন বাড়ি ছেড়ে দিই। মিড্‌ল টেম্পল-এর ফাউন্‌টেন কোর্টেই আমার চেম্বার্স ছিলো। সেখানকারও ঘর ছেড়ে

চ'লে যাবার নোটিস এসে গেছে। পরিচিত কেউ-ই আর আমার সঙ্গে কথা বলে না। সকলেই এড়িয়ে চলে।

'বুঝলুম, কোর্ট আমায় ডাউট-এর বেনিফিট দিয়ে ছেড়ে দিলেও লোকে আমায় তার কোনো বেনিফিট দিতে চায় না। লোকের দোষ নেই। আমার স্ত্রীর মৃত্যুর আসল কারণটা তো বাইরে প্রকাশ হয় নি। লোকে তাই ধ'রেই নিয়েছিলো, ওর মধ্যে নিশ্চয় আমার কোনোরকম হাত ছিলো। নিতান্ত কপাল-জোরেই আমি আইনের ফাঁকিতে ফাঁসি যেতে-যেতে বেঁচে গিয়েছি।

'ঘর গেলো, চেম্বার্স গেলো, প্র্যাক্‌টিস গেলো। হাতে সামান্য যা-কিছু টাকা ছিলো, কালক্রমে তা-ও গেলো। এক উপায় ছিলো, স্ত্রীর মতো আমারও আত্মহত্যা করা। কিন্তু আমার সাহসে কুলোয় নি। তারপর দিনেরবেলা ওই দেশলাই বিক্রি, আর রাত্তিরবেলায় এই এমব্যাঙ্কমেণ্ট। মিড্‌ল টেম্পল-এর মায়া কাটাতে পারি নি। তাই তারই কাছে গিয়ে দাঁড়াই।

'নাম পালটিয়েছি। গোঁফদাড়ি রেখে চেহারা বদলেছি। পাছে চোখের চাউনিতে ধরা পড়ি, সেই ভয়ে সর্বক্ষণ রঙিন চশমা প'রে থাকি। এখন আমি সত্যি-সত্যিই রবার্ট ব্রাউন।'

কৌতূহল দমন করতে না পেরে আমি জিগ্যেস করলুম, 'কতোদিন আগেকার ঘটনা এটা?'

রবার্ট ব্রাউন জবাব দিলেন, 'তা প্রায় কুড়ি বছর হ'লো।'

আমি বললুম, 'কুড়ি বছর? তা হ'লে আপনি কি নলিনীমোহন চ্যাটার্জিকে চিনতেন? তিনিও তো ওই সময়কারই ব্যারিস্টার। মিড্‌ল টেম্পল-এরই।'

ব্রাউন বললেন, 'নলিনী চ্যাটার্জিকে খুবই চিনতুম। তাঁর সঙ্গে

প্রণয়ও ছিলো। আমরা একরাত্তিরেই মিড্‌ল টেম্পল থেকে বার্‌-এ কল্‌ড হই। তিনি কি আপনার কেউ হন?'

আমি জানালুম— তিনি আমার খুড়ো।

শুনেই ব্রাউন চট ক'রে বেঞ্চি ছেড়ে উঠে প'ড়ে বললেন, 'গুড নাইট।' স্বরটা কিরকম যেন রুক্ষ-রুক্ষ শোনালো ব'লে মনে হ'লো। আমি 'গুড নাইট সার্‌' বলতে-বলতেই দেখি, ব্রাউন অদৃশ্য হ'য়ে গেছেন। কৌতূহল কি মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিলো? না-বুঝে কি কোনো অপরাধ ক'রে বসলুম?

অতো রাত্তিরে আর বাস্‌ ট্রেন কিছুই পাওয়া গেলো না। স্ট্র্যাণ্ড পর্যন্ত এসে একটা ট্যাক্সি ধরলুম।

আমি তারপর আরো কিছুদিন লণ্ডনে ছিলুম। অনেকবারই সেই পুরনো পথ দিয়ে মিড্‌ল টেম্পল হ'য়ে লিংকন্স ইন্‌-এ যাতায়াত করেছি। কিন্তু আর একদিনের জন্যেও ব্রাউন-এর দেখা পাই নি। মিড্‌ল টেম্পল-এর দোরগোড়ায়ও না, এমব্যাঙ্কমেণ্টের ধারেও না।

আমার প্রতিজ্ঞা কিন্তু আমি অক্ষরে-অক্ষরে পালন ক'রে এসেছি। সময় যখন জানা গিয়েছিলো তখন পুরনো কাগজপত্তর ঘেঁটেঘুঁটে ব্রাউন-এর আসল পরিচয়টা বের করা কিছু দুঃসাধ্য কর্ম ছিলো না। কিন্তু ওদিকে খোঁজ নেবার সত্যিই কোনো চেষ্টা করি নি। জানবার খুব ইচ্ছে করলেও, করি নি।

দেশে ফিরে এসে কতোবার ব্রাউন-এর কথাটা খুড়োকে জিগ্যেস করবো-করবো ভেবেছি। কিন্তু প্রতিবারই কথাটা জিবের ডগায় এসে আটকে গেছে।

রলো

লণ্ডন শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ভিক্টোরিয়া স্ট্রীট। বেশ লম্বা-চওড়া রাস্তা। নতুন রাস্তা ব'লে দু-ধারের বাড়িগুলো বেশ ঝকঝকে তকতকে। ওই রাস্তার পাঁচ নম্বর বাড়িতে টি. এল. উইলসন অ্যাণ্ড কোম্পানির অফিস। সলিসিটরের ফার্ম। অ্যাটর্নির ব্যবসার অন্য পাঁচ-রকম কাজ এঁদের কম হ'লেও প্রিভি কাউন্সিলের কাজ একেবারে পয়লা নম্বরের।

এই ফার্ম এক-সময় আমার এক অ্যাটর্নি খুড়োর প্রিভি কাউন্সিল এজেণ্ট ছিলেন। বিলেত যাবার সময় ফার্মের মালিকের উপর খুড়ো আমাকে এক পরিচয়পত্র লিখে দিয়েছিলেন।

ফার্মের প্রতিষ্ঠাতা এককালে টি. এল. উইলসন হ'লেও তিনি তখন বহুকাল গত। আর, তাঁর নামের পিছনে অ্যাণ্ড কোং লেখা থাকলেও ফার্মের বর্তমান মালিক মাত্র একজন— অ্যালেকজাণ্ডার হেম্যান উইলসন, সংক্ষেপে এ. এইচ. উইলসন।

আমি লণ্ডনে পৌছবার দু-তিন দিন পরেই উইলসনসাহেবের সঙ্গে দেখা করতে বেরুলুম। অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট না ক'রেই। ভাবলুম, দেখা হয় ভালোই, নচেৎ আর-একদিন গেলেই হবে। সত্যি কথা বলতে কি, বিলিতি লোকের সঙ্গে দেখা করতে গেলে যে আগের থেকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট ক'রে রাখতে হয়, আর সেইটেই যে এটিকেট, এটা আমার তখনো জানা ছিলো না।

ভিক্টোরিয়া স্ট্রীটের বুকের উপর দিয়ে দিনরাত বাস্ চলছে। বাস্

থেকে নেমে পাঁচ নম্বর বাড়ি খুঁজে নিতে কিছুমাত্র দেরি হ'লো না। টি. এল. উইলসন কোম্পানির অফিসও সহজেই মিললো। সদর-দরজার পাশে দেয়ালের উপর লম্বা কাঠের বোর্ড টাঙানো। প'ড়ে দেখা গেলো, উইলসনদের অফিস দোতলায়।

দোতলায় উঠতে সামনেই এক দরজার উপর শাদা অক্ষরে টি. এল. উইলসন কোম্পানির নাম পেণ্ট করা। বোঝা গেলো, এইটেই তাঁদের অফিসঘর। দরজা ঠেলে হল্-এ ঢুকতেই পনেরো-ষোলো বছরের এক ছোঁড়া এগিয়ে এসে জিগ্যেস করলে, 'কাকে খুঁজছেন?' আমি উইলসন-সাহেবের নাম করায় সে বললে, 'অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে কি?' আমি জানালুম, 'না, অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট নেই। তবে যখন এসেই পড়েছি তখন তিনি দেখা করেন ভালো, নয় আবার এক-সময় আসবো।'

আমার নাম লেখা একটা ভিসিটিং-কার্ড আর খুড়োর দেওয়া চিঠিখানা ছেলেটার হাতে এগিয়ে দিলুম। আমায় একটু বসতে ব'লে সে কার্ড আর চিঠিটা নিয়ে ভিতরে চ'লে গেলো। মিনিট দুয়েক পর ফিরে এসে বললে, 'চলুন, মিস্টার উইলসন খালি আছেন। আপনার সঙ্গে দেখা করবেন। আপনার ছাতি টুপি ওভারকোট আমার হাতে দিতে পারেন।' তাই দিলুম। তারপর তার পিছন-পিছন গিয়ে ভিতরের দিকের এক ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হলুম।

দরজায় টোকা মারতেই ভিতর থেকে শব্দ এলো, 'কম্ ইন।' ছোকরা দরজা খুলে হাঁকলো, 'মিস্টার চ্যাটার্জি সার্।' তারপর নিঃশব্দে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেলো।

ভিতরে ঢুকে দেখি, বেশ বড়োসড়ো ঘর। মাঝখানে প্রকাণ্ড এক সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তার তিনধার ঘিরে দশ-বারোটা চেয়ার। কাঁচের সার্শিওয়ালা জানলাগুলো সমস্ত আষ্টেপৃষ্ঠে বন্ধ। শুভ্রমূর্তি এক

সাহেব সামনে ব'সে আছেন। তাঁর পিছনে ফায়ারপ্লেসে ধিকিধিকি আগুন জ্বলছে। আশেপাশে মেঝের উপর কালো-কালো টিনের বাক্স সাজানো। তাতে শাদা রঙের হরফে মক্কেলদের নাম লেখা। একদিকের এক শেল্‌ফে বিস্তর আইনের বই। চেহারা দেখে মনে হ'লো, সে-সব হালের নয়, সেই টি. এল. উইলসনের আমলের।

আমায় এগিয়ে আসতে দেখে উইলসন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ডান-হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। শেকহাণ্ড ক'রে মুখের সামনের চেয়ারটা দেখিয়ে বললেন, 'বোসো।' বসলুম। সাহেবও নিজের চেয়ার নিলেন।

সাহেবের চেহারা বেশ কাটা-কাটা। দাড়ি নেই, গোঁফ আছে। একমাথা পাকা চুল। মুখ দেখে মনে হয়, সমস্ত চেহারাটা কেমন-একটু যেন কঠোর কঠিন। বোধ হ'লো, মানুষের খারাপ দিকটা সদাসর্বদা দেখতে-দেখতে যেন পৃথিবীর উপর উইলসনসাহেবের ঘোর বিতৃষ্ণা এসে গেছে। কেবল চোখের দুটো নীল তারার উপর ভালো ক'রে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, তাতে মাঝে-মাঝে কৌতুকের হাসি ঝিলিক মেরে যাচ্ছে।

উইলসনের পরনে সেই সেকালের কাট্‌-এর এক মর্নিংকোট। তার তলায় শক্ত ডবলব্রেস্ট সার্ট। ষ্টিফ কলার ঘিরে কালো টাই। ঘোর ছাই-রঙের ডোরাকাটা প্যাণ্টুলুন। কালো জুতোর উপর খয়েরি রঙের স্প্যাট্‌স আঁটা।

সাহেব অত্যন্ত ধীরে-ধীরে কথা বলেন। প্রত্যেকটি শব্দ এমন পরিষ্কার উচ্চারণ করেন যে, বিদিশির পক্ষে তাঁর প্রতি কথা বুঝে নেওয়া একটুকুও কষ্টকর হয় না। সব নিয়ে মনে হ'লো, তিনি যে-যুগের মানুষ, অর্থাৎ সেই ভিক্টোরিয়ন যুগ থেকে এদিকে বড়ো বেশি স'রে আসেন নি।

কুশলবার্তার পর্ব শেষ হ'লে উইলসনসাহেব খুড়োর কথা জিগ্যেস করলেন। আমি জানালুম, তিনি ভালোই আছেন। তারপর সরাসরি

প্রশ্ন না ক'রে তিনি কৌশলে এক-এক ক'রে জেনে নিলেন, আমি কেন বিলেতে এসেছি, কি পড়তে, কোথায় আছি, কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা এবং তিনি নিজে আমার জন্যে কিছু করতে পারেন কিনা।

সব কথারই একে-একে জবাব দিলুম। উইলসনসাহেব পরের দিন রাত্তিরে তাঁর ওখানে ডিনার খাবার নেমন্তন্ন করলেন। সাহেবকে প্রচুর ধন্যবাদ জানিয়ে তখনকার মতো বিদায় নিলুম।

আট নম্বর কুইনস্‌বরী প্লেসে উইলসনের বসতবাড়ি। সেটা সাউথ কেনসিংটন স্টেশন থেকে দু-মিনিটের পথ। আমি যেখানে থাকি, সেখান থেকে তিনটে বাঁক নিলে বড়ো রাস্তা, ক্রমওয়েল রোড। ক্রমওয়েল রোড থেকে কুইনস্‌বরী প্লেস একলাফে পৌছনো যায়।

পরদিন রাত্তির আটটার কিছু আগেই উইলসনসাহেবের বাড়িতে হাজির হলুম। সাহেবের চাকর এসে আমাকে তাঁর স্টাডিতে নিয়ে গেলো।

স্টাডি ঘরটা ছোট্টোখাট্টো হ'লেও বেশ ঘরঘরোয়া রকমের। চার-দিকে বই-এর শেল্‌ফ। কিন্তু তাতে একটিও আইনের কেতাব নেই। সাহিত্য ইতিহাস আর ভ্রমণকাহিনী। শেল্‌ফে একসেট বিখ্যাত ইয়োলোবুক পত্রিকার সংগ্রহ দেখলুম। এই সংগ্রহ পূর্বে বা পরে আর কোথাও দেখি নি। এর উপর আমার বড়োই লোভ প'ড়ে গিয়েছিলো। যখনই উইলসনসাহেবের বাড়ি যাই তখনই ওই-সেটের একটা টেনে বের করি। অব্‌রী বিয়ার্ডসলীর আঁকা অদ্ভুত ছবিগুলো দেখতে এতো ভালো লাগতো যে, কি বলবো।

মিনিট পনেরো আলাপ-সালাপের পর চাকর এসে খবর দিলে, আহার প্রস্তুত। উইলসন চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। ওঠবার রকম দেখে বেশ বুঝলুম, সাহেবের বাতের ধাত। তাই, ঠাণ্ডাকে অতো ভয়।

স্টাডি খুলতেই হল্‌। হল্‌-এর ওপারে ডাইনিং রুম। তিরিশ ফুট

লম্বা সেকেলে ঘর। মাঝখানে ওই-যুগেরই একটা প্রকাণ্ড টেবিল। মাথার উপর সেকেলে বেলোয়ারী ঝাড়। খানেওয়ালা তো আমরা দু-জন। টেবিলের একপ্রান্তে আমাদের দু-জনের খাবার জায়গা টিমটিম করছে।

ধরন-ধারনে বুঝলুম, উইলসনসাহেব হয় বিপত্নীক, নয় অবিবাহিত। পরে জেনেছিলুম, সাহেব কোনো কালেই বিয়ে করেন নি। চাকর-বাকরের হাতে সংসার। তখনো চাকর-রাখা পয়সা দিয়ে মনিব-রাখার সামিল হ'য়ে ওঠে নি। কাজেই, উইলসনসাহেবের সংসারও কিছু অচল হ'য়ে পড়ে নি।

ডাইনিং রুমে ঢুকে চমকে গেলুম। সামনের দেওয়ালে লরেন্সের আঁকা হরাস হেম্যান উইলসনের বুকপ্রমাণ ছবি। যাঁরা সংস্কৃতবিদ্যায় খানিক-দূর অগ্রসর হয়েছেন, তাঁদের কে না হরাস হেম্যান উইলসনের নাম জানেন? পুরাকালের সংস্কৃত-কলেজের অধ্যাপকরা সবাই এঁর বন্ধু ছিলেন। তিনি নিজে এ-দেশ থেকে রিটায়ার ক'রে গিয়ে ও-দেশের অক্সফোর্ডে সংস্কৃতের অধ্যাপক হয়েছিলেন। কতো যে সংস্কৃত বই-এর ইংরিজি অনুবাদ করেছেন তার আর ঠিকঠিকানা নেই।

লরেন্সের আঁকা হরাস হেম্যান উইলসনের ছবি সুপ্রসিদ্ধ। আমি অনেক জায়গায় ওই ছবির কপি ছাপা দেখেছি। কিন্তু আসল ছবিটা এখানে এলো কি ক'রে? তার পরেই মনে হ'লো, তাই তো, উইলসন-সাহেবের নাম তো অ্যালেকজাণ্ডার হেম্যান উইলসন। তবে কি দু-জনের মধ্যে কোনো সম্বন্ধ আছে?

আমার মনোভাব যেন ইঙ্গিতেই বুঝতে পেরে উইলসন দেওয়ালে টাঙানো ছবির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমার পিতামহ।' আমি ব'লে উঠলুম, 'হরাস হেম্যান উইলসন ভারতবাসীমাত্রেরই নমস্য, সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের কাছে তো প্রাতঃস্মরণীয়।'

উইলসনসাহেব আস্তে-আস্তে কথায়-কথায় আমাকে জানিয়ে দিলেন, হরাস হেম্যানকে লেখা অনেক বাঙালী মনীষীর চিঠি তাঁর কাছে আছে। আমার যদি কখনো দেখবার আগ্রহ হয়, তা হ'লে তিনি সেগুলো বের ক'রে রাখবেন। আমি যখন ইচ্ছে তখনই এসে সেগুলো স্বচ্ছন্দে দেখে যেতে পারি।

উইলসন ব'লে দিয়েছিলেন, প্রত্যেক শনিবার রাত্রে আমি গিয়ে যেন তাঁর সঙ্গে ডিনার খাই। যেন তাতে কোনোরকম সংকোচ বোধ না করি। গেলে তিনি সত্যিই খুশি হবেন। বিশেষ কোনো কাজে আটকা না পড়লে আমি প্রত্যেক শনিবারেই উইলসনসাহেবের ওখানে ঠিক যেতুম। বার-বার যাতায়াতের ফলে তাঁর সঙ্গে বেশ মাখামাখি হ'য়ে উঠেছিলো।

ব্যবসা আইনের হ'লেও উইলসনের কাব্যানুরাগ প্রবল মাত্রায় ছিলো। তিনি ইংরিজি কাব্য-সংগ্রহ থেকে অনেক ভালো-ভালো কবিতা আমায় প'ড়ে শোনাতেন। কিন্তু সে-সব কোনোটাই আধুনিক কালের নয়। সবই টেনিসন ব্রাউনিং-এর আগেকার। মাঝে-মাঝে আমার মতামতও জিগ্যেস করতেন। আমি তখন বুদ্ধিতে বালকমাত্র হ'লেও বয়েসে এমন জায়গায় এসে পড়েছি যে, সব তাতেই টিপ্পনীর ফোড়ন কাটবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারতুম না। আমার কথাবার্তা শুনে উইলসনসাহেব মনে-মনে হাসতেন কিনা জানি না, কিন্তু বাহিকে সেটা কখনো প্রকাশ পায় নি। সুতরাং আমার সাহস বেড়ে গিয়েছিলো।

এক শনিবার আমি যেতেই উইলসন জানালেন, 'চ্যাটার্জি, তোমার জন্যে হরাস হেম্যানের বাক্স থেকে তাঁর পুরনো চিঠিগুলো বের ক'রে নামিয়ে রেখেছি। দেখতে চাও তো বলো।' 'বিলক্ষণ,'—ব'লে, আনন্দে দুটো হাত একত্র ঘষতে-ঘষতে আমি উইলসনসাহেবের রাইটিং

ডেস্কের সামনে চেয়ার পেতে বসলুম। সাহেব সবুজ শেড্-ঢাকা রিডিং ল্যাম্পটা জেলে দিলেন। ড্রয়ার থেকে একটা ম্যাগনিফাইং গ্লাসও বের ক'রে ফেললেন। তারপর একটি-একটি ক'রে চিঠি টেবিলের উপর অতি সন্তর্পণে আমার সামনে ধরতে লাগলেন।

সেকালের এমন কোনো জ্ঞানীগুণী বাঙালী ছিলেন না, যিনি হরাস হেম্যান উইলসনের সঙ্গে পত্রব্যবহার করেন নি। সবচেয়ে মজা লাগলো, রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, দেওয়ান রামকমল সেনের চিঠিগুলো পড়তে। এখনো মনে আছে, রামমোহন রায় তাঁর চিঠিতে শংকরাচার্যের আবির্ভাবকাল নিয়ে আলোচনা করছেন। সেখানেও তাঁর সেই নিজস্ব যুক্তিমূলক ভদ্র ভাষা।

আমার বিশেষ আগ্রহ দেখে উইলসনসাহেব কতক চিঠি আমাকে টাইপ করিয়ে দিয়েছিলেন। আমি একটা কার্ডবোর্ডের বাক্সে সেগুলো অতি যত্ন ক'রে সাজিয়ে আমার ট্রাঙ্কে তুলে ফেলেছিলুম। একদিন আবার প'ড়ে দেখবার জন্যে বাক্সটা বের ক'রে দুর্মতিবশত সেটাকে ম্যানটল্পিসের উপর রেখেছিলুম। আমাদের ফ্ল্যাটের চাকরানী ফায়ারপ্লেসে আগুন ধরাতে গিয়ে অসাবধানে বাক্সসুদ্ধু চিঠিগুলো দিয়েছিলো পুড়িয়ে। চক্ষুলজ্জায় দ্বিতীয়বার আর উইলসনসাহেবকে কপি করিয়ে দিতে বলতে পারি নি।

আসল চিঠিগুলো কিন্তু এখন ভালো জায়গাতেই রাখা আছে। উইলসনসাহেব উইল ক'রে সেগুলো ইণ্ডিয়া অফিসের লাইব্রেরিতে দিয়ে গিয়েছিলেন। এক-সময় এই লাইব্রেরিরই অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁর পিতামহ, হরাস হেম্যান উইলসন।

আমি নভেম্বরের গোড়াতেই বিলেত পৌছিয়েছিলুম। সুতরাং দেখতে-দেখতেই ক্রীসমাস এসে পড়লো। সারা ইয়োরোপ জুড়ে

ক্রীসমাস একটা মস্ত বড়ো উৎসব। আমাদের দেশের পুজোর মতো আর-কি।

যীশু খ্রীস্টের জন্ম নিয়ে এই পর্ব হ'লেও ধর্মানুষ্ঠানের চেয়ে এর সামাজিক অনুষ্ঠানের দিকটাই বিদিশির চোখে বেশি ক'রে পড়ে। ছেলেমেয়েরা স্কুল-কলেজ থেকে এই সময় ছুটিতে বাড়ি আসে। পরিবারস্থ সকলে একসঙ্গে জোটে। বেশ-একটু গুরুতর রকমের খানাপিনা চলে। সঙ্গে-সঙ্গে আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও সে অনেক রকমের। এই সময় সামান্য কার্ড থেকে শুরু ক'রে দামী-দামী জিনিস কিছু-না-কিছু ক্রীসমাস প্রেসেণ্ট হিসেবে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করার রেওয়াজ আছে সর্বত্র।

আমি একটা কার্ড কিনে উইলসনসাহেবকে পাঠিয়ে দিলুম। তাঁর কাছ থেকেও একটা কার্ড পেলুম। খুঁজে-পেতে একটা হালফিলের ইংরিজি কাব্য-সংগ্রহের বই কিনে রাখলুম, উইলসনকে হাতে-হাতে দেবো ব'লে। তখনো ইংরিজি কবিতা একেবারে দুর্বোধ্য হ'য়ে ওঠে নি। তাই ভরসা ছিলো, এই কবিতার বই ক্রীসমাসের উপহার পেয়ে উইলসনের মতো বৃদ্ধলোক হঠাৎ আঁতকে উঠবেন না।

ক্রীসমাসে আমার কোথাও যাবার নেই শুনে উইলসনসাহেব আমাকে ক্রীসমাস-ডিনারে নেমন্তন্ন ক'রে বসলেন। আমি তো বেঁচে গেলুম। কোনো-একটা রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক কোণে চুপ ক'রে ব'সে অপরের আমোদ-প্রমোদ দেখার চেয়ে উইলসনের সঙ্গে সন্ধ্যে কাটানো আমার পক্ষে হাজার গুণে ভালো।

ক্রীসমাসের দিন সন্ধ্যের সময় বেরুতে গিয়ে দেখি, বাইরে বরফ পড়ছে। আকাশ থেকে কে যেন পেঁজা তুলোর ছোটো-ছোটো টুকরো চারদিকে উড়িয়ে দিচ্ছে। এর আগে কখনো বরফ পড়া দেখি নি।

বাড়ির পর্টিকোয় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে দেখলুম। দেখতে খুবই ভালো লাগছিলো। আকাশ একেবারে পরিষ্কার ঝকঝকে। কোথাও একটু মেঘের আভাসও নেই। দেখতে-দেখতে এক নিমেষের মধ্যে বাড়ি-ঘরদোর রাস্তাঘাট সব শাদায়-শাদায় জলজ্বল করতে লাগলো।

বেরিয়ে পড়লুম্। মোটা ওভারকোটটার গলা ঘাড় পর্যন্ত তুলে দিলুম। নরম্ ফেল্টের টুপির কোনা কপালের উপর ভুরু পর্যন্ত টেনে নামিয়ে দেওয়া গেলো। দু-হাতে দুটো দস্তানা এঁটে নিলুম। কবিতার বইটা ব্রাউন কাগজে মোড়া ছিলো। সেটাকে ওভারকোটের পকেটে পুরে ফেললুম। বাইরে বেরুতেই বরফের ঝিরঝিরে হালকা পাত এসে গায়ে পড়তে লাগলো। ঠাণ্ডার গুণেই হোক, কি প্রথম বরফপড়া দেখতে পাওয়ার আনন্দেই হোক, শরীরটা বেশ রিনরিন ক'রে উঠলো। কি জানি কেন, হঠাৎ ভারী স্ফূর্তি বোধ হ'তে লাগলো।

বরফের উপর দিয়ে চলতে গিয়ে অনভ্যাসবশত পা হড়কে যাবার উপক্রম হওয়াতে, আস্তে-আস্তে অতি সাবধানে হাঁটতে হ'লো। দেখি, বরফপড়া দেখবার জন্যে অনেকেই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়েছেন। ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েরা হৈ-হল্লা ক'রে রাস্তায় ছোটাছুটি লাগিয়ে দিয়েছে। একবার পড়ছে, একবার উঠছে। আবার পড়ছে আবার উঠছে। উঠে, বাঁইবাঁই ক'রে দৌড়চ্ছে।

ঢিমে তালে চলতে-চলতে একটু দেরিতেই উইলসনসাহেবের বাড়ি পৌছলুম। বরফ পড়ায় ক্ষতি কিছু হয় নি। শুধু জুতো জোড়াটা বেশ ভিজে গিয়েছিলো। ওভারকোটের উপর যে-বরফ পড়েছিলো, তা গ'লে গিয়ে বিন্দু-বিন্দু জল হ'য়ে কোটের গায়ে সেঁটে রইলো। তার উপর আলোর ছটা পড়ায় ঠিক যেন কুচি হীরের মতো ঝিকমিক ক'রে জ্ব'লে উঠছিলো।

উইলসনসাহেবের স্টাডির ফায়ারপ্লেসে বেশ গনগনে আগুন। ফায়ারপ্লেসের তিনধার ঘিরে যে পিতলের রেলিং দেওয়া ফেণ্ডার আছে, তার উপর জুতোসুদ্ধু পা তুলে দিয়ে বসতে সাহেব আমায় উপদেশ দিলেন। কিছুতেই ছাড়লেন না। দু-মিনিটে জুতোর তলা দিয়ে ধোঁয়া উঠতে শুরু করলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভিজে জুতো শুকিয়ে খটখটে।

ফায়ারপ্লেসের মাথার উপর ম্যানটল্‌পিসে অনেকগুলো ক্রীসমাস কার্ড সাজানো। দেখলুম, সার্ ফ্রান্সিস ইয়ংহসব্যণ্ড, সার্ অরল স্টাইন, রীস ডেভিডস, ফ্রেড্‌রিক টমাস, টমাস আরনল্ড প্রভৃতি বিখ্যাত-বিখ্যাত লোকের পাঠানো কার্ডের পাশেই আমার দেওয়া কার্ডখানাও রয়েছে।

শিগ্‌গিরই খেয়ে নিতে হবে। কারণ, উইলসনসাহেবের সেবক ভৃত্যকে আজ তাড়াতাড়ি ছুটি দেবার কথা। সে বেচারীরও তো ক্রীসমাস আছে। ডাইনিং রুমে ঢুকে দেখি, সেখানে এক অপরূপ সজ্জা। একদিকে একটা ক্রীসমাস ট্রি দাঁড় করানো। তার ডালে-ডালে লাল নীল শাদা হলদে সরু লিকলিকে মোমবাতির আলো জ্বালা। মাথার উপর হলী গাছের ডাল টাঙানো। ডালের মাঝে-মাঝে বৈঁচির মতো ছোটো-ছোটো লাল-লাল বেরী ঝুলে আছে। সমস্ত সিলিং জুড়ে এধার থেকে ওধার পর্যন্ত মিস্‌লটো ঝোলানো।

উইলসনসাহেব মৃদু হেসে বললেন, 'আমার এখানে কোনো নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোক নেই। থাকলে, মিস্‌লটোর নিচে আজকের দিনে যে-কোনো মেয়েকে ধরতে পারলে তাকে প্রাণভ'রে চুমু খেতে পারতে। পশ্চিমদেশে ক্ষণে-ক্ষণে এই চুমু খাওয়ার প্রথাটা আমার চোখে বড়ো কটু ব'লে বোধ হ'তো। যখন-তখন যেখানে-সেখানে আমাদের দেশের নমস্কারের বদলে

ওরা গালে-মুখে কিংবা হাতের আঙুলে চুমু খায়। দেখতে আমার ভারী বিশ্রী লাগে।

চটপট খাওয়া সেরে নিয়ে আমরা আবার স্টাডিতে ফিরে এলুম। চাকর কফি দিয়ে গেলো। উইলসনের জন্যে ডিকেণ্টার-ভর্তি পোর্ট আর একবাক্স সিগার একটা টেবিলে রেখে দিলো। বেশ-একটু গুরু ভোজনই হয়েছিলো। টার্কি, চর্বিওয়ালা হাঁস, ক্রীসমাস পুডিং সব ক'টাই গুরুপাক। উইলসনসাহেব সে-রাত্তিরের ডিনারে তাঁর বরাবরকার অভ্যেসের পোর্টের বদলে সরু ডাণ্ডাওয়ালা গোল গেলাসে একপাত্র শ্যাম্পেন চড়িয়েছিলেন।

কফি শেষ ক'রে আমি সাহেবকে বললুম, 'আজকের দিনে বাইবল থেকে একটু-কিছু পড়লে হ'তো না?' উইলসন তো অবাক! জিগ্যেস করলেন, 'তুমি বাইবল পড়ো নাকি?' আমি বললুম, 'পড়ি। আর, অনেক বারই পড়েছি। আমি খ্রীস্টানিতে বিশ্বাস না করলেও যীশুর ধর্মে খুবই আস্থা রাখি।'

উইলসন আর-কিছু বললেন না। আঙুল দিয়ে একটা শেল্‌ফের তাক দেখিয়ে দিলেন। সেখান থেকে ইয়া মোটা এক আধমনী ওজনের বাইবল পেড়ে নিয়ে এসে উইলসনের সামনে টিপয়ের উপর রাখলুম। সাহেব জিগ্যেস করলেন, 'কোথা থেকে প'ড়ে শোনাবো?' আমি বললুম, 'আমার কথা যদি ধরেন, তা হ'লে সার্‌মন অন্ দি মাউণ্টটাই পড়ুন। ওটা আমার অতি উপাদেয় লাগে।'

অতি চোস্ত স্বরে ধীরে-ধীরে প্রত্যেকটি শব্দ স্পষ্ট উচ্চারণ করতে-করতে উইলসনসাহেব সার্‌মনটা প'ড়ে যেতে লাগলেন। এমনি মেতে গেলেন যে, একটা পড়া শেষ হ'তেই আর-একটা ধরেন। আমি স্তব্ধ হ'য়ে ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা তাই শুনে যেতে লাগলুম। বিন্দুমাত্রও ক্লান্তি বোধ হ'লো না।

রাত্তির বারোটা বাজে। আমি একবার চট ক'রে হল্-এ গিয়ে আমার ওভারকোটের পকেট থেকে সেই কবিতার বইটা নিয়ে এলুম। মোড়ক খুলে উইলসনের হাতে দিলুম। উইলসন বইটার উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে শুধু বললেন, 'থ্যাংক ইউ, চ্যাটার্জি।' আর-কিছু না। কিন্তু তাঁর চোখ দেখে বুঝলুম, তিনি সত্যিই খুশি হয়েছেন।

হঠাৎ বন্ধ দরজা ভেদ ক'রে গানের সুরের ক্ষীণ আওয়াজ ভেসে এসে ঘরে ঢুকলো। উইলসন বললেন, 'ক্রীসমাস ক্যারল। শুনবে নাকি?' আমি হ্যাঁ বলাতে, আমায় ডাইনিং রুমে নিয়ে গেলেন। রাস্তার দিকের কাঁচের জানলার উপরকার পর্দা তুলে দিলেন। সাহেবের মতো আমিও একটু গা-আড়াল ক'রে দাঁড়িয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম, ছোটো-ছোটো ছেলেরা একসঙ্গে একই সুরে পৃথিবীতে শান্তি আর মনুষ্যসমাজে মৈত্রী কামনা ক'রে প্রার্থনাগীত গাইছে।

বরফপড়া শেষ হয়েছে। মাথার উপরে পরিষ্কার আকাশে অসংখ্য তারা। চারিদিক শান্ত শুভ্র পবিত্র। মনে হ'লো, স্বর্গের দেবশিশুরা বুঝি মর্ত্যে নেমে এসেছে।

গান শেষ হবো-হবো, এমন সময়ে উইলসন পকেট থেকে একটা পাউণ্ড-নোট বের ক'রে বললেন, 'চ্যাটার্জি, যাও তো। আমি আর এই ঠাণ্ডায় বেরোবো না। তুমি এই নোটটা ওদের থলিতে ফেলে দিয়ে এসো।' আমি নোটের সঙ্গে আমার নিজের পকেট থেকে একটা রুপোর হাফ-ক্রাউন যোগ ক'রে, বাইরে গিয়ে ওদের সর্দারের হাতের ঝুলিতে ফেলে দিয়ে এলুম। সর্দার বার-কয়েক থ্যাংক ইউ করলে। আর-কিছু কথা জোগাতে না পেরে আমিও মাথা নেড়ে গোটাকতক থ্যাংক ইউ আউড়ে গেলুম। তারপর দু-পক্ষের গুড নাইট।

উইলসন ডাইনিং রুমের পর্দা ফেলে আলো নিভিয়ে দিলেন। হল্

পেরিয়ে স্টাডিতে ঢোকবার আগেই শোনা গেলো, সদর-দরজার বাইরে কি-রকম যেন একটা কুঁই-কুঁই শব্দ হচ্ছে। কে যেন দরজা আঁচড়াচ্ছে। ঠাণ্ডা লাগার ভয় ভুলে গিয়ে উইলসনসাহেব সদর-দরজা একবার খুললেন, পরমুহূর্তেই আবার ঝড়াক ক'রে বন্ধ ক'রে দিলেন। চেয়ে দেখি, তাঁর হাতে একটা কুকুর-বাচ্চা। তার গলায় নীল রঙের রিবনে বো-বাঁধা।

উইলসন একটু মুচকে হেসে বললেন, 'নিশ্চয়ই ওই ক্যারল-গাইয়ে ছোঁড়াদের কাণ্ড।' কুকুরের বাচ্চাটাকে এনে আগুনের ধারে রাগ্-এর উপর শুইয়ে দিলেন। তারপর কোথা থেকে একটা পিরিচে খানিক দুধ নিয়ে এসে বাচ্চাটার মুখের সামনে ধরলেন। কুকুরটা চুকচুক ক'রে দুধ খেয়ে ফেলে উইলসনসাহেবের দিকে এমনভাবে মিটমিট ক'রে তাকালো যে, মনে হ'লো সে-ও যেন বললে— থ্যাংক ইউ।

দুধ খাইয়ে উইলসন কুকুরের মাথায় একবার হাত বুলিয়ে দিলেন। আরামে তার চোখ বুজে এলো। মিনিটখানেকের মধ্যে রাগ্টার উপরেই সে কাত হ'য়ে ঘুমিয়ে পড়লো। উইলসন তার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। অতো কঠোর চেহারার মানুষের ভিতরটায় যে এতো মমতা ভরা থাকতে পারে, সেটা স্বচক্ষে না দেখলে কখনো বিশ্বাস হ'তো না।

পরদিন বক্সিং ডে। এ সেই হাত-কাড়াকাড়ির বক্সিং নয়। ডাক-পিওন বাক্স-ভরা ক্রীসমাস প্রেসেণ্ট পিঠে ব'য়ে নিয়ে লোকের দোরে-দোরে বিলি ক'রে বেড়ায় ব'লে এই দিনের নাম রাখা হয়েছে বক্সিং ডে। আমাদের ফ্ল্যাটের নকার-এ কড়ানাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে ডাক-পিওনের পায়ের চেনা শব্দ। চিঠি নয়, তা হ'লে এতোক্ষণ চিঠির বাক্সে ফেলে দিয়ে চ'লে যেতো। নিশ্চয়ই হাতে-হাতে দেবার পার্শেল-টার্শেল কিছু হবে।

সদর-দরজা খুলতেই মাথার টুপিটা একটু তুলে ধ'রে পোস্টম্যান

বললে, 'অল্ দি কম্প্লিমেণ্টস অভ্ দি সিস্‌ন সার্।' আমি মাথা নেড়ে বললুম, 'সেম টু ইউ।'

আমার নামে একটা পার্শেল ছিলো। পোস্টম্যান সেটা হল্-এর টেবিলের উপর নামিয়ে রাখলো। আমি পকেট থেকে একটা শিলিং বের ক'রে তার হাতে গুঁজে দিলুম। 'থ্যাংক ইউ সার্, থ্যাংক ইউ কাইণ্ডলি,' বলতে-বলতে পোস্টম্যান তার পেটফোলা ভারী পোস্ট-ব্যাগটা কাঁধে চড়িয়ে নিয়ে তালে-তালে পা ফেলতে-ফেলতে পাশের বাড়ির দিকে চ'লে গেলো।

বেশ ভারী পার্শেল। মোড়ক খুলে দেখি, এ কি? এ যে সেই ইয়লোবুকের সেট! উইলসনসাহেবের কাছ থেকে ক্রীসমাসের উপহার। আমি একদম থ!

পরের শনিবার উইলসনের বাড়ি গেলুম। স্টাডির ফায়ারপ্লেসের সামনে রাগ্-এর উপর কুকুর-বাচ্চাটা ব'সে। উইলসনসাহেব একটা বড়ো মার্বেলগুলির মতো রবারের বল্ নিয়ে ছুঁড়ছেন, আর কুকুরের বাচ্চাটা সেই বল্ মুখে ক'রে তুলে নিয়ে এসে তাঁর পায়ের কাছে রাখছে। আমি বাচ্চাটার জন্যে একটা ডগ্‌বিস্কিট নিয়ে গিয়েছিলুম। একটু-একটু ক'রে ভেঙে-ভেঙে তাকে দিতে লাগলুম। বিস্কুটের টুকরো মুখে ক'রে নিয়ে কুকুরটা এক চৌকির তলায় গিয়ে ব'সে লুকিয়ে-লুকিয়ে খায়, আর আমার দিকে মিটিমিটি তাকায়।

উইলসন বললেন, 'কুকুরটার নাম রেখেছি রলো।' তারপর কুকুরকেই সম্বোধন ক'রে বললেন, 'কেমন নাম রে? ভালো নয় কি?' অবোল কুকুর আনন্দে ল্যাজ নাড়তে-নাড়তে সায় জানালো।

বিস্কুট খাইয়ে-খাইয়ে আর আদর দিয়ে-দিয়ে আমি রলোর সঙ্গে বেশ ভাব ক'রে নিয়েছিলুম। আমি তার গলা চুলকে দিই, তার মাথায়

হাত বুলোই, তাকে কাতুকুতু দিই। সে আমার হাত চাটে আর ল্যাজ নাড়ে।

পাঁচ বছর পর দ্বিতীয়বার যখন বিলেত যাই তখন রলোর সঙ্গে আবার দেখা। রলো তখন বেশ বড়ো হ'য়ে উঠেছে। কিন্তু দেখলুম, সে আমায় ভোলে নি। আমার গা'টা একটু শুঁকে নিয়ে সামনের দু-পা তুলে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর ল্যাজনাড়ার সে কী ধুম।

শব্দ শুনে, স্টাডির দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে উইলসনসাহেব রলোকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'আমাদের পুরনো বন্ধু, না রে রলো?'

আরনেস্ট রীস-এর বাড়িতে

বিলেত যাচ্ছি শুনে গুরুদেবই আরনেস্ট রীস-এর কাছে এক চিঠি দিয়েছিলেন। রীস গুরুদেবের খুব ভক্ত। তাঁর উপর একটা বই-ও লিখেছেন। বইটা অবশ্য তেমন-কিছু নয়।

লণ্ডনে পা ফেলেই প্রথম কাজ লিংকন্স ইন্‌-এ ভর্তি হওয়া। সেটা সেরে ফেললুম। তারপর গুরুদেবের চিঠিটা ডাকে আরনেস্ট রীস-এর কাছে পাঠিয়ে দিলুম। জবাব এলো। রীস লিখেছেন, অমুক দিন বিকেল পাঁচটায় আমার এখানে চা খেতে এসো। এর আগেই জাহাজে ব'সে শুনেছিলুম, আজকাল, অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধের ঠিক পরেই লোকে আর সহজে কাউকে লাঞ্চ-ডিনারে ডাকে না। আলাপ-সালাপ যা-কিছু তা চা খাইয়েই সেরে নেন। বিলিতি চা-এর পর্ব ঠিক এ-দেশের মতন নয়। তার আনুষঙ্গিক উপকরণ যৎসামান্যই।

আরনেস্ট রীস বলেছিলেন, বিকেলে আসতে। কিন্তু লণ্ডনে নামা ইস্তক দেখছি, সেখানে বিকেল ব'লে কিছু নেই। আছে শুধু সন্ধ্যে আর রাত্তির। সকাল থেকেই অন্ধকার। সব সময় আলো জালিয়ে রাখতে হয়। তার উপর অনবরত টিপ্‌টিপ্‌ ক'রে বৃষ্টি। আমি ঠিক শীতকালের মুখেই গিয়ে পড়েছিলুম কিনা। যাই হোক, রীস সময় নির্দেশ দিয়েছিলেন পাঁচটা। তাই যথেষ্ট। তা সে বিকেলই হোক, আর সন্ধ্যেই হোক।

আরনেস্ট রীস থাকতেন গোল্‌ডার্স গ্রীনে। শহর ছাড়িয়ে সেই একেবারে একটেরে। দেশে থাকতেই শুনেছিলুম, ইংরেজরা পাংচুয়ালিটির

বিষম ভক্ত। ঠিক সময় অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট না রাখতে পারলে, ওই অন্ধকার দেশে ওরা চোখে আরো অন্ধকার দেখে। দ্বিতীয়বার নাকি আর অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট দেয় না। মনে-মনে আঁচ ক'রে নিলুম, রীস-এর বাড়ি ঠিক সময় পৌছতে গেলে অন্তত এক ঘণ্টা আগে নিজের বাড়ি থেকে বেরুনো চাই।

আন্ডারগ্রাউণ্ড ইলেকট্রিক ট্রেন চেপে গোলডার্স গ্রীন স্টেশনে আসা গেলো। আরনেস্ট রীস-এর বাড়ির রাস্তা, ওয়েস্ট হীথ্ ড্রাইভে পৌছে ঘড়ি খুলে দেখি, পাঁচটা বাজতে তখনো আধ-ঘণ্টা বাকি। পৌছতে পাছে এক মিনিটও দেরি হয়, সেই ভয়ে সাবধান হ'তে গিয়ে দেখছি, তিরিশ মিনিট আগেই পৌছে গেলুম। এখন করি কি? রীস-এর বাড়ির খানিক দূরে গিয়ে এদিক-ওদিক পাইচারি করতে লাগলুম। বেশ-একটু দূরেই যেতে হ'লো, পাছে রীসদের কেউ আবার দেখে ফেলে আমাকে নেহাত গ্রাম্য ব'লে ঠাউরে বসেন।

মুহুর্মুহু ঘড়ি দেখছি। কিন্তু ঘড়ি আর চলে না। আধ-ঘণ্টাকে মনে হ'লো যেন দু-ঘণ্টা। অবশেষে ঘড়িতে পাঁচটা বাজতে এক মিনিট। রীস-এর বাড়ির সামনের ছোটো গেটটা খুলে সদর-দরজার মুখে এসে দাঁড়ালুম। ঘড়িতে যখন কাঁটায়-কাঁটায় পাঁচটা তখন দরজার গায়ে টেপা-ঘণ্টার বড়িতে একটা হাল্কাগোছের টিপ দিলুম। মিনিটখানেক পর এক দাসী এসে দরজা খুলে দাঁড়ালো।

দাসীর হাতে নিজের নামলেখা কার্ডটা দিলুম। বাড়ির ভিতর ঢুকে, হল্-এ তারই হাতে টুপিটা ছাতিগাছটা আর ওভারকোটটা জিম্মা ক'রে দেওয়া গেলো। ড্রয়িং রুমের দরজা খুলে দাসী হাঁকলো, মিস্টার চ্যাটার্জি।

রীসসাহেব উঠে এসে দোরগোড়া থেকে আমায় ভিতরে নিয়ে গেলেন। সেখানে মিসেস রীস আছেন, তাঁদের কন্যা রেচল আছেন, আর

আছেন ইয়া লম্বাচওড়া এক যণ্ডামার্ক পুরুষ। তাঁর মাথাটা প্রায় কামানো। মনে হয় যেন সম্প্রতি পিতৃ- কি মাতৃশ্রাদ্ধ ক'রে উঠেছেন। গলা ব'লে কিছু নেই। ঘাড়ে-গর্দানে সমান। ধড় থেকেই একেবারে মুণ্ডুটা সোজা উঠে গেছে।

রীস একে-একে সকলের সঙ্গে আমায় পরিচয় করিয়ে দিলেন। ভদ্রলোকের নাম একটা কি বললেন বটে, কিন্তু আমি সেটা ঠিক ধরতে পারলুম না। কেমন মনে হ'লো যেন জার্মান নাম। স্যুটের কাট্ দেখেও বোধ হ'লো, তিনি ইংরেজ নন, কনটিনেনটল। শেষে শুনলুম, তিনি কোন্ এক জার্মান ইউনিভার্সিটির ডক্টর। তিনি কিসের ডাক্তারি করেন, সেটা জিগ্যেস করাটা ভদ্রতায় বাধে কিনা ভাবছি, এমন সময় অন্য অতিথিরা একে-একে এসে পড়তে লাগলেন।

হা-ডু-ডু পর্ব শেষ হ'তে বোঝা গেলো, এঁদের মধ্যে কেউ কবি, কেউ নভেলিস্ট, কেউ নাট্যকার, কেউ জরনালিস্ট। ঘরের মধ্যে একটু মৃদু গুঞ্জন উঠলো। জোরে কথা বলাটা বিলিতি এটিকেট্-বিরুদ্ধ। কিন্তু সবাইকার স্বর ছাপিয়ে উঠছে জার্মান ডক্টরের কণ্ঠস্বর। তিনি ইংরিজি এটিকেটের ধার দিয়েও গেলেন না। তার উপর ওই অতোখানি উঁচু-গলায় তিনি অনর্গল ব'কে চলেছেন। এক মিনিটও মুখ কামাই নেই। কিন্তু যা ইংরিজির ছিরি! সে-ইংরিজি শুনে মনে হ'লো, আমি কম্‌সে-কম তবু খানিকটা ইংরিজি আয়ত্ত করতে পেরেছি।

আন্দাজে-আন্দাজে জার্মান ডক্টরের বক্তব্য যা বুঝতে পারলুম, তার থেকে মনে হ'লো, তিনি ইয়োরোপীয়নদের মৃতদেহের গোর দেওয়া প্রথাটার ঘোরতর বিরোধী। দাহ করারই পক্ষপাতী। কেন যে, তাই নিয়ে তিনি এক মস্ত বক্তৃতা জুড়ে দিলেন। খানিক পরে অতিথিদের মধ্যে কেউ মুখে আধখানা আঙুল চাপা দিয়ে হাই তুললেন, কেউ-বা পষ্টাপষ্টিই উসখুস

করতে লাগলেন। কিন্তু জার্মান পণ্ডিতের সেদিকে কোনোই দৃক্‌পাত নেই। তিনি তাঁর বক্তব্য বেবাক ব'লেই চললেন।

বেচারী নাট্যকার পকেট থেকে একরাশ টাইপ-করা কাগজ বের করেছিলেন। ইচ্ছে ছিলো, তাঁর নতুন-লেখা নাটকটি সবাইকে প'ড়ে শোনাবেন। কিন্তু তা আর হ'লো না। জার্মানের মুখে ঠিক যেন কামানের গর্জন শোনা গেলো, 'গোর দিতে-দিতে ইয়োরোপে শেষে আর কোথাও বাস করবার একটুও স্থান থাকবে না। না থাকে না-ই থাকুক, তাতে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই। আমাদের দেশ এতো বড়ো যে, সেখানে শুধু মরতে কেন, সবাইকে ধ'রে জ্যান্তে কবর দিলেও কখনো স্থানাভাব ঘটবে না।'

আমাদের সংস্কৃতে বলা আছে, এই অসার সংসারে কেবল দুটি মাত্র সারবস্তু— এক সজ্জনসঙ্গ আর এক কাব্যরসপান। আশা করা গিয়েছিলো, ও দুটিরই বিলিতি নমুনা রীস-এর বাড়িতে একটু-আধটু মিলবে। কিন্তু সেখানে ওই মুস্ক জার্মান পণ্ডিতের মুখে শবতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনতে-শুনতে এই অসার পৃথিবীকে যেন আরো দ্বিগুণ অসার ব'লে মনে হ'তে লাগলো। একজন অতিথি তো রণে ভঙ্গ দিয়ে আসি ব'লে উঠেই পড়লেন। আমিও উঠি-উঠি করছি, এমন সময় উঠতে গিয়ে জাঁতিকলে প'ড়ে গেলুম।

রীসসাহেব আমায় দেখিয়ে পণ্ডিতমশায়কে বললেন, 'এই যে, মিস্টার চ্যাটার্জিই তো এখানে আছেন। উনি ভারতবর্ষের লোক। উনি ও-বিষয়ে আপনাকে অনেক তথ্য জানিয়ে দিতে পারবেন।'

আর ওঠা গেলো না। জার্মান ডক্‌টর তাঁর চেহারার মাপসই একটা লম্বা সিগার ধরিয়ে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। গিলতে এলেন বললেই কথাটা পরিষ্কার ক'রে বলা হয়। জায়াণ্ট অ্যাণ্ড দি ডঅর্ফ রূপকথার ছবিটা সহজেই মনে ভেসে উঠলো। জার্মান ডক্‌টরের প্রজ্ঞাটা ঠিক তাঁর

আকার-সদৃশ কিনা, সেটা আমি বলতে পারলুম না, কিন্তু তাঁর কণ্ঠস্বরটা যে অবিকল তাই, সেটা আমি হলফ ক'রে বলতে রাজী।

আমার দিকে এক প্রচণ্ড নয়নবাণ হেনে তিনি বললেন, 'তাই তো মশায়, আপনি আছেন তা তো এতোক্ষণ দেখি নি। বলুন তো মশায়, আপনিই বলুন, আমার কথাটা সত্যি কিনা? সেই অ্যাড্যাম-এর আমল থেকেই তো আপনাদের শবদাহ প্রথা চ'লে আসছে? তাই না?'

আমি সবিনয় নিবেদন করলুম, 'আপনি এতোক্ষণ যে আমায় দেখেন নি, তাতে আমি কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ নই। আমার চেহারাটা হঠাৎ কারুর নজরে পড়বার মতো খুবসুরত আদবেই নয়। তবে একটা কথা মনে রাখবেন, আমরা কস্মিন্ কালে অ্যাড্যাম-এর আমল থেকে কাল গণনা করি নে। মান্ধাতার আমল থেকেই বরাবর ক'রে আসছি। এই সঙ্গে এটাও আপনার জেনে রাখা উচিত, ভারতীয়দেরও মধ্যে একটা অংশ আছেন, যাঁরা দলে বড়ো কম ভারী নন, তাঁরা শবদাহ করাটাকে অতিশয় গর্হিত কর্ম ব'লে মনে করেন। এ-সম্বন্ধে একটা ঐতিহাসিক গল্প আছে—'

গল্পের গন্ধ পেয়ে সকলে নিজের-নিজের চেয়ার টেনে আমায় ঘিরে বসলেন। আমি কিছুটা কুণ্ঠিত হ'য়ে পড়ছি দেখে তাঁরা সবাই বললেন, 'বলুন আপনার গল্প। কিছুমাত্র সংকোচ করবেন না। ঐতিহাসিক না হ'লেও আমরা কিছু মনে করবো না। গল্প হ'লেই হ'লো।'

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে আকবর নামে এক বাদশা ছিলেন। তিনি আপনাদের রানী এলিজাবেথ্-এরই সমসাময়িক। তাঁর নাম আপনারা কেউ-কেউ হয়তো শুনেও থাকবেন।'

অতিথিদের মধ্যে একজন লাফিয়ে উঠলেন। বললেন, 'হ্যাঁ, আমি শুনেছি। আক্‌বার দি গ্রেটের কথাই তো আপনি বলছেন? তিনি মোগল না?'

আমি বললুম, 'আপনি ঠিকই নির্দেশ করছেন। আকবর বাদশা যে মোগল ছিলেন, এটা সব ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। আর ধর্মে গোঁড়া না হ'লেও তিনি যে জীবনের শেষপর্যন্ত মুসলমান ছিলেন, এটাও খুব ঠিক। তাই মৃত হ'লে, তাঁর দেহ পুড়িয়ে না-ফেলে গোর দেওয়া হয়েছিলো। কবরের উপর তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীর বাদশা এক ভালো-গোছের ইমারতও বানিয়ে দিয়েছিলেন। সে-ইমারত আজও আগ্রা শহরের কাছে সিকন্দ্রা ব'লে এক জায়গায় মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। টুরিস্টরা আগ্রায় গেলে তাজমহলের সঙ্গে সেটাও একবার দেখে আসেন।'

'তারপর ?' কে যেন একজন জিগ্যেস করলেন।

'তারপর ? তারপর অনেক দিন চ'লে গেলো। মোগলরা তখন আর ততোটা শক্তিমান নন। মোগল-সাম্রাজ্যও ভেঙে পড়ছে। এমন সময় আগ্রার কাছাকাছি এক রাজত্বে সুরজমল ব'লে এক জাঠ-সর্দার মাথা চাগিয়ে উঠলেন। এই সুরজমল জাঠ আকবর বাদশার উপর জাতক্রোধ। তিনি মনে করতেন, আকবর খুব বুদ্ধি ক'রেই হিন্দুদের প্রতি ভালো ব্যবহার ক'রে গেছেন। তাইতেই তো হিন্দুরা তাঁর আনুগত্য স্বীকার ক'রে ভারতবর্ষে মোগল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সহায় হয়েছিলেন। তাই আকবর হচ্ছেন মোগল বাদশাদের মধ্যে সব চাইতে বড়ো দুশমন।'

একসঙ্গে এতো কথা, বিশেষত ইংরিজি ভাষায়, ব'লে ফেলে আমার দমবন্ধ হবার উপক্রম। দম নেবার জন্যে খানিকটা থামলুম। এবার স্বয়ং মিসেস রীস জিগ্যেস করলেন, 'তারপর কি হ'লো মিস্টার চ্যাটার্জি ?' দেখলুম, তাঁরও বেশ মৌতাত লেগেছে। কিন্তু সেটা গল্পের গুণে কি জার্মান পণ্ডিতের হাত এড়াবার দরুন, তা ঠিক বুঝতে পারলুম না।

আমি খানিকটা জিরিয়ে নিয়ে আবার শুরু করলুম, 'সুরজমল জাঠ

জানতেন, মুসলমানের শব, শব অভাবে কঙ্কাল একবার কোনোক্রমে পুড়িয়ে দিতে পারলে মৃত ব্যক্তি, আপনারা যাকে বলেন হেল্, সোজা তাতেই গিয়ে প্রবেশ করে।' হেল্ কথাটা মহিলাদের সামনে উচ্চারণ করাটা ইংরিজি ভদ্রতায় বাধে। কথার পিঠে কথাটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়াতে আমি একটুখানি জিব্ কেটে অপ্রতিভভাবে মিসেস রীস আর রেচলের দিকে চাইলুম।

মিসেস রীস অভয় দিয়ে বললেন, 'ব'লে যান মিস্টার চ্যাটার্জি, আপনি নির্ভয়ে ব'লে যান। আমি ও-সব কিছু মনে করি না।'

'তা হ'লে বেশ, তবে শুনুন—' ব'লে আমি আবার আরম্ভ করলুম, 'একদিন সুরজমল তাঁর সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এসে আগ্রা শহর লুঠ ক'রে নিলেন। তারপর সিকন্দ্রায় গিয়ে আকবর বাদশার কবর খুঁড়ে তাঁর হাড়গোড়গুলো মাটির নিচেয় পোঁতা কফিন থেকে বের ক'রে ফেললেন।'

গল্প করতে-করতে সামনের দিকে চেয়ে দেখি, দাসী ড্রয়িং রুমের দরজাটা একটু ফাঁক করলো। এক ব্যক্তি নিঃশব্দে ঘরের ভিতরে এলেন। তখন সকলে আমার গল্প শুনতে ব্যস্ত। আগন্তুকের নামও কেউ শুনতে পেলেন না, কেউ তাঁর দিকে তাকালেনও না।

আমি গল্পটা শেষ করলুম, 'তারপর সুরজমল জাঠ আকবর বাদশার হাড় ক'খানায় আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন।' সকলে একবাক্যে ব'লে উঠলেন, 'আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে দিলেন ?'

আমি বললুম, 'তা দিলেন বৈকি ? ইতিহাস তো সেই রকমই লেখে।'

সকলে উৎসুক হ'য়ে আবার প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু তারপর কি হ'লো ?'

আমি বললুম, 'তারপর যে কি হ'লো, তা আমার সঠিক জানা নেই। মরবার পর আকবর বাদশা যে কোথায় অবস্থান করছিলেন, আর সুরজমল জাঠ তাঁর হাড়গুলো পুড়িয়ে দেবার পর তিনি সে-স্থান

ছেড়ে আর-কোথাও ছিট্‌কে গিয়ে পড়েছিলেন কিনা, সে-সংবাদ আমি ইতিহাসের কোনো পুঁথিতে এ-পর্যন্ত খুঁজে পাই নি।'

ইতিমধ্যে হ'লো কি, যে-ভদ্রলোকটি নিঃশব্দে ড্রয়িং রুমে ঢুকেছিলেন, তিনি এক কাণ্ড ক'রে বসলেন। ঘরের কোণের টিপয়ে জল-ভরা একটা ফুলদানিতে একগোছা টিউলিপ ফুল সাজানো ছিলো। কেউ তাঁর দিকে দৃষ্টিপাত করছে না দেখে ভদ্রলোকটি ফুলদানি থেকে ফুলগুলো তুলে নিয়ে চোঁ ক'রে তার সব জলটুকু এক নিশ্বাসে চুমুক দিয়ে পান ক'রে ফেললেন। তারপর ক'টা টিউলিপ ফুল ডাল থেকে ছিঁড়ে মুখের মধ্যে পুরে ঠিক জলখাবারের মতো চিবুতে লাগলেন।

তখন আমায় ছেড়ে সকলেরই তাঁর দিকে নজর পড়লো। আরনেস্ট রীস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোকটির দিকে এগিয়ে গেলেন। সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, 'আরে এজ্‌রা পাউণ্ড যে? কতোক্ষণ?' এজ্‌রা পাউণ্ড তখনো টিউলিপ চিবিয়ে চলেছেন। কোনো উত্তর দিলেন না। ব্যাপার দেখে অমন বক্তার যে জার্মান ডক্‌টর তাঁরও মুখ দিয়ে আর কথা সরে না।

এইবার আমি উঠলুম। অনেকক্ষণ বসা গেছে। আর না। দাঁড়িয়ে উঠে সবার ভাগে পড়ে, এমন একটা বাও ক'রে আমি বললুম, 'গুড নাইট টু অল্ অভ্ ইউ।'

ড্রয়িং রুম থেকে বেরিয়ে হল্-এ এলুম। দাসী ওভারকোটটা পরিয়ে দিলে। টুপি ছাতি নিয়ে এলো। ইংরিজি কেতা অনুসারে তার হাতে দু-আনির মতো চাঁদির একটা থ্রি-পেনি পিস্ গুঁজে দিতে হ'লো।

রাস্তায় নেমে আপন মনে চলেছি। হঠাৎ এজ্‌রা পাউণ্ডের কাণ্ডটা মনে প'ড়ে যাওয়াতে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলুম। কাছে যে একটা কনস্টবল্

দাঁড়িয়ে ছিলো, অতো দেখি নি। জুতোজোড়াটা মস্‌মস্‌ করতে-করতে কনস্টবল্‌টা আমার দিকে এগিয়ে এসে বললো, 'স্টেডি সার্‌!'

হাসি একদম বন্ধ হ'য়ে গেলো।

এক-দৌড়ে গোলডার্স গ্রীন টিউব্‌স্টেশনে গিয়ে উঠলুম।

তারপর সোজা একেবারে মাটির নিচে।

টেডী কোল

এডওয়ার্ড কোলের সঙ্গে আমার পরিচয় আরনেস্ট রীস-এর কল্যাণে।

আরনেস্ট রীস তখন লণ্ডনের বিখ্যাত পাবলিশার ডেণ্ট্‌দের রিডার। সঙ্গে-সঙ্গে তাঁদের বের-করা এভ্‌রীম্যানস লাইব্রেরি সিরিজেরও জেনারল এডিটর। অনেক রকমের লোক তাই রীস-এর কাছে আসা-যাওয়া করতেন।

রিডার আসলে কি বস্তু, তা একটু খুলে ব'লে দিলে বোধ হয় ভালো হয়। বড়ো-বড়ো পাবলিশিং হাউসের প্রত্যেকটিতে নানা রকমের রিডার নিযুক্ত থাকেন। কোনো লেখক বই ছাপাবার জন্যে প্রকাশকের কাছে তাঁর রচনা পাঠালে সেটা প্রথম যায় রিডারের টেবিলে। বইটা ভালো ক'রে প'ড়ে-শুনে রিডারই পাবলিশারকে পরামর্শ দেন, বইটা ছাপানোর উপযুক্ত কিনা। রিডারের উপদেশ মতো পাবলিশাররা লেখককে জানিয়ে দেন, বই ছাপাবার ভার তাঁরা নেবেন, কি না নেবেন।

সেই সময় আমার এক অদ্ভুত শখ গিয়েছিলো। ইংরিজি ভাষায় কবিতা লেখবার খেয়াল মাথায় চেপেছিলো। বাংলায় যারা গুছিয়ে দু-লাইন পদ্য লিখতে পারে না, তাদেরই দেখি কেমন মনে হয়, তাদের হাতে ইংরিজি কবিতা খুলবে ভালো। তা ছাড়া আমার নিজের আর-এক ভরসা ছিলো। আমাদের গুরুদেব ইংরিজি গদ্যে কবিতা লিখে নাম ক'রে ফেলেছেন। আমি তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্য। তাঁরই কাছে ছেলেবয়েসে ইংরিজি শেখা। সুতরাং কুছ নেই তো থোড়া-থোড়াই বা কেন না হবে?

কিন্তু মুশকিল ওই ইংরিজি ভাষাটাকে নিয়ে। ওটা কি কোনো-একটা

নিয়ম মেনে চলবে ? ছ'বছর বয়সে ইংরিজিতে হাতে খড়ি হয়। তারপর পাঠ্য-অপাঠ্য অনেক ইংরিজি বই প'ড়ে ফেলেছি। কিন্তু পড়লে কি হবে ? আজ পর্যন্ত ইংরিজি প্রেপজিশন-এর রহস্য ভেদ করতে পারি নি। ডেফিনিট ইনডেফিনিট আর্‌টিক্‌ল নিয়েও এখনো গোলতাল পাকিয়ে যায়। ইংরিজি ইডিয়ম তো ছেড়েই দিই। তার না-আছে মাথা, না-আছে মুণ্ডু। দেশে থাকতে যে-সব ইংরিজি কথাগুলোকে খুব গুরুগম্ভীর ব'লে মনে করতুম, সেগুলোই যখনি এখানকার খাস-ইংরেজদের শোনাতে গেছি তখনি দেখেছি, তাঁরা মুখে রুমাল দিয়ে কাশতে শুরু ক'রে দিয়েছেন। ইঙ্গিত বুঝতে একটুখানিও দেরি হয় না! এ-অবস্থায় আমার ইংরিজি কবিতাগুলো একজন সমজদার ইংরেজকে দিয়ে একবার দেখিয়ে না নিলে, ভদ্রলোকের পাতে দেওয়ার চেষ্টা করা কোনোক্রমেই চলে না।

রীসকে ধ'রে পড়লুম। মনের বাসনা গোপন না ক'রে তাঁকে খুলেই বললুম। রীস বোধ হয় বাঙালী ছাত্রদের ইংরিজি রচনার সঙ্গে আগের থেকেই কিছুটা পরিচিত ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি আমায় বললেন, তাঁর হাতে অনেক কাজ। আমার লেখাগুলো ভালো ক'রে দেখে দেবার মতো সময় তাঁর হাতে মোটেই নেই।

তবে একেবারে নিরাশ না ক'রে রীস জানালেন, 'তা এক কাজ করো। আমি তোমাকে টেডী কোল-এর কাছে একটা চিঠি দিচ্ছি। লোকটা ছেলেমানুষ হ'লেও সত্যিকারের কবি। তার কবিতা বেশি ছাপা হয় নি। তবু যে দু-চারটে পত্র-পত্রিকায় বের হয়েছে, সেগুলো সত্যিকার কাব্য। তুমি তাকে গিয়ে ধ'রে পড়ো। সে বেশ মনোযোগ দিয়েই তোমার লেখা কবিতাগুলো দেখে দেবে। লোকটি গরিব। কাজ হ'য়ে গেলে কিঞ্চিৎ দক্ষিণান্ত ক'রে দিয়ো।'

তথাস্তু। রীস-এর দেওয়া চিঠির খামের উপর কোল-এর ঠিকানা

লেখা ছিলো। হ্যামারস্মিথ অঞ্চলে তাঁর বাস। আমার আর তর সয় না। তখুনি কোল-এর সন্ধানে ছুটলুম।

লণ্ডন শহরে তাড়াতাড়ি কোথাও যেতে হ'লে সবাই মাটির নিচের ইলেকটি ক ট্রেন চড়ে। মিনিটে-মিনিটে হুসহুস ক'রে এদিক-ওদিক ট্রেন ছুটছে। নিমেষের মধ্যে গন্তব্য স্থানে পৌছে দিচ্ছে। তারই একটায় চেপে হ্যামারস্মিথে চললুম। খানিক পরে মাটির তলা থেকে উপরের আলো-বাতাসে উঠে দেখি, পল্লীটা অতি নগণ্য। বর্ণনা ক'রে শোনাবার মতো মোটেই নয়।

নম্বর খুঁজে কোল-এর বাড়ি বের করলুম। লণ্ডনের সব রাস্তারই তু-ধারের বাড়িগুলো ঠিক একরকম দেখতে। একটা থেকে আর-একটাকে চিনে নেবার জো নেই। যেন যমজ দু-ভাই। আলাদা ক'রে মনে রাখবার মতো কোনো চিহ্নই তাদের গায়ে নেই। বাড়িগুলোরও না-আছে কোনো ছিরি, না-আছে কোনো ছন্দ। সৌন্দর্যের কোনো বালাই-ই নেই। কেবল ব্রিটিশ জাতটার মতোই খাড়া হ'য়ে সলিড্ দাঁড়িয়ে আছে।

কোল-এর বাড়ির সামনের তিন ধাপ সিঁড়ি লাফিয়ে সদর-দরজার নকার-এ জোরসে এক ঘা মারলুম। ঘণ্টা বাজাবার কোনো ব্যবস্থা কোথাও দেখতে পেলুম না।

খানিক পরে এক বুড়ি এসে দরজাটা একটু ফাঁক ক'রে যেন নল্‌চে আড়াল দিয়ে দাঁড়ালো। সঙ্গে-সঙ্গেই ভক্ ক'রে একটা বিদিকিচ্ছিরি গন্ধ বেরিয়ে এলো। সে এক পাঁচমিশুলি গন্ধ। অয়েলক্লথের গন্ধের সঙ্গে গ্যাসের গন্ধ, তার মধ্যে মিশিয়ে আছে কিপার্ মাছের শুঁট্‌কো গন্ধ, আর কাঁচা পেঁয়াজের নাক-ঝাঁঝানো গন্ধ। স্যাৎসেঁতে একটা ভেঁপো গন্ধও সেই সঙ্গে কোথা থেকে ভেসে আসছে।

বুড়ি দরজার আড়ালে গা-ঢাকা দিয়েই কোমরে হাত দিয়ে আড়চোখে

আমার আপাদমস্তক টেরিয়ে-টেরিয়ে দেখতে লাগলো। কিছু বলে না কয় না। আমার মতন চেহারার জীব বোধ হয় তার দরজায় ইতিপূর্বে কখনো উদয় হয় নি।

একেই ব্রাউন রঙের গায়ের চামড়া, তার উপর অল্-ব্রাউন পোশাক-আশাক। স্যুট ব্রাউন রঙের। বুকপকেট থেকে একটুখানি বের করা সিল্কের রুমালখানাও ব্রাউন রঙের। টাই ফেল্টের টুপি জুতো মোজা সবই ব্রাউন। জুন মাস। তাই ব্রাউন ওভারকোটটা সঙ্গে নেই। আর-কিছু না শিখলেও বিলিতি কাপড়-চোপড় দস্তুর মতন মিলমিশ ক'রে পরতে তখনই বেশ শিখে গেছি। কোথাও একটু কোনো ফাঁকফোঁক নেই।

বুড়ির দিকে ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলুম, বেশ মোটা-সোটা চেহারা। মুখের হাতের চামড়া কোঁচকানো। পরনে মোটা বনাতের পা পর্যন্ত লম্বা কালো ঘাগরা। সেই গ্রীষ্মকালেও পিঠের উপর হাতে-বোনা কালো পশমের শাল। পায়ে কালো ফেল্টের জুতো। উপরের ঠোঁটে অল্প একটু গোঁফের আভাস। একেবারে আসল লণ্ডন কক্‌নি।

জাত-কক্‌নি যে, সেটা পরমুহূর্তেই তার কথায় ধরা প'ড়ে গেলো। বুড়ি প্রায় পাঁচ মিনিটটাক আমার দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে থেকে প্রশ্ন করলে, 'কি চান?' প্রশ্নটা আন্দাজে ওই ব'লেই আমার মনে হ'লো। কথাটার বিন্দু-বিসর্গ এক বর্ণও বুঝতে পারি নি। শুধু একটা আওয়াজই কানে এলো।

স্যুট-দোরস্ত হ'লেও কক্‌নি ভাষায় তখনো আমার কান দোরস্ত হয় নি। হবে কি ক'রে? ওরা যে পেপারকে বলে পাইপার, হেড্‌কে বলে এড্, এয়ারকে বলে হেয়ার। বুঝবো কি ক'রে? প্রেসিডেন্সি কলেজে জেম্‌সসাহেব, মনোমোহন ঘোষ-সাহেব প্রভৃতি পাকাপোক্ত অক্সফোর্ড গ্রাজুয়েট আর স্টার্লিংসাহেব, হোম্‌সসাহেব ইত্যাদি খাঁটি কেমব্রিজ

গ্র্যাজুয়েট— তাঁদেরই কাছে আমাদের ইংরিজি পড়া। আমরা হঠাৎ ককনি উচ্চারণ সমঝাই কি ক'রে? তার জন্যে যে আলাদা ক'রে কান তৈরি হওয়া চাই।

যাই হোক, আমি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিবেদন করলুম, 'এতোদূর আসার উদ্দেশ্য আমার অসৎ কিছু নয়। উদ্দেশ্য, শুধু শ্রীযুত এডওয়ার্ড কোল মশায়ের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করা।'

জবাব শুনে স্ত্রীলোকটি তক্ষুনি ধ'রে ফেললে, আমি বিদেশী লোক। তাই বোধ হয় যেন একটু দয়া হ'লো। আর কথাবার্তা চালাবার বৃথা চেষ্টা না ক'রেই দরজাটা আরো-একটু ফাঁক ক'রে আমাকে ভিতরে আসতে ইঙ্গিত করলো।

তারপর আমায় নিয়ে গিয়ে সামনের সিঁড়ির তলায় দাঁড় করিয়ে বুড়ো আঙুলটা উঁচু ক'রে উপর দিকে দেখালো। অস্যার্থ বুঝলুম, কোল-সাহেব ওই বাড়ির ওপর-তলায় থাকেন। সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেলেই তাঁর দর্শন পাওয়া যাবে।

সিঁড়িতে উঠলুম। নিচের হল্-এ দেওয়ালের গায়ে যদিও একটা আল্না মতন জিনিস লটকানো ছিলো, তবুও টুপিটা সেখানে টাঙিয়ে রেখে যেতে ভরসা পেলুম না। হাতে নিয়েই চললুম।

দোতলায় উঠতেই দেখি, সামনের ঘরের দরজায় এক টুক্‌রো কাগজ আঁটা। কাগজের উপর লেখা আছে, মিস্টার এডওয়ার্ড ই. কোল। যাক্, তা হ'লে এই ঘরটাই বটে। দরজার গায়ে একটা টোকা মারতেই ভিতর থেকে আওয়াজ এলো— 'কম্ ইন্,' অর্থাৎ সোজা চ'লে এসো। শিক্ষিত লোকের বেশ ভদ্র গলা।

দরজার হাণ্ডেল্ ঘুরিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকলুম। ঘরটা একেবারে দৈন্যের প্রতিমূর্তি। একদিকে একটা আধ-ভাঙা ওয়াস্‌হাণ্ড স্ট্যাণ্ড, আর-এক

দিকে একটা রংচুট লোহার খাট। খাটের কাছে একটা নড়বড়ে চেয়ার। তার পিঠে ঝুলছে শুঁয়োওঠা একটা কোট। খাটের উপর সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে শুয়ে একটা মানুষ।

মুখটা শুধু বের করা। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল। সেই চুলের ফ্রেমে বসানো ছোট্টো একটি সুশ্রী মুখ। মুখের রংটা কিন্তু দারুণ ফ্যাকাসে। মুখ থেকে প্যাট্‌প্যাট্ বেরিয়ে আছে দুটো জলজলে নীল চোখ। দেখলেই বোঝা যায়, সে-দুটো চোখ এ-জগতের কিছু চায় না।

আমি বললুম, 'হা-ডু-ডু।' কোল বললেন, 'হা-ডু-ডু।' শিষ্টাচার সমাপ্ত হ'লো। তারপর দু-জনেই খানিক চুপ। প্রথম আলাপের স্বাভাবিক সংকোচ। ইংরিজি কেতায় এক আব্‌হাওয়ার কথা পাড়া যেতে পারতো। কিন্তু কি জানি কেন মনে হ'লো, সে-কথাটা ওখানে বড্ডো বেয়াড়া বেখাপ্পা শোনাবে।

পকেট থেকে রীস-এর চিঠিটা বের ক'রে কোল-এর হাতে দিলুম। চিঠিতে কি লেখা ছিলো, সেটা আমার জানা। কারণ, ইংরেজরা পরিচয়পত্র দিয়ে, সেটা খামে পুরে এঁটে দেন না। খামটা খোলাই থাকে। তাই চিঠিতে কি আছে-না-আছে, সেই নিয়ে চুল ছিঁড়ে মাথা ঘামাতে হয় না।

কোল তখনো বিছানা ছেড়ে উঠছেন না দেখে, আমি মনে-মনে আঁচ করলুম, তিনি বোধ হয় অসুস্থ। আমি বললুম, 'অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলুম। আজ তা হ'লে উঠি। আর-একদিন না হয় আসবো।' —এই ব'লে আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলুম।

কোল আমায় আবার বসতে বললেন। তারপর একটু ম্লান হাসি হেসে যা বললেন তার মর্মার্থ হ'লো এই : কোল-এর পায়জামা-স্যুট নেই। থাকবার মধ্যে আছে একটিমাত্র নেভী ব্লু রঙের স্যুট, যার কোটটা ওই চেয়ারের পিছনে ঝুলছে। কিন্তু তার প্যাণ্টুলুনটা আপাতত

হাতছাড়া। পন্‌শপে, অর্থাৎ পোদ্দারের দোকানে বাঁধা পড়েছে। সেটাকে যতোক্ষণ-না খালাস ক'রে ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে ততোক্ষণ বিছানা ছেড়ে কোল-এর আর ওঠবার উপায় নেই।

আমি জানতুম, বিলিতি পন্‌শপে জুতো-জামা থেকে আরম্ভ ক'রে ঘড়ি ছড়ি আংটি চশমা সবই একাধারে বাঁধা দেওয়া চলে।

কোল আবার জানালেন, তিনি একটা প্রবন্ধ লিখে ডেলী নিউজ-এ ছাপবার জন্যে সেটাকে একটা মেসেঞ্জর বয়ের হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। ডেলী নিউজ তাঁর কবিতা প্রবন্ধ মাঝে-মাঝে ছাপেন। আর, তাঁর অবস্থা বুঝে দক্ষিণাটাও হাতে-হাতে অগ্রিম দিয়ে থাকেন। তিনি মনে করছেন, এই প্রবন্ধটার জন্যে এক গিনি পাওয়া যাবে। তার থেকে পাঁচ শিলিং দিয়ে পোদ্দারের দোকান থেকে প্যাণ্টুলুনটা ছাড়িয়ে নিয়ে মেসেঞ্জর বয় এখুনি এসে পড়লো ব'লে। আমি যেন ততোক্ষণ দয়া ক'রে একটু বসি।

'বিলক্ষণ।' —ব'লে আমি ধপ ক'রে আবার সেই চেয়ারেই ব'সে পড়লুম। স্বরচিত পঁচিশটা ইংরিজি কবিতা লেখা ঝকঝকে বাঁধানো খাতাটা আমার সঙ্গেই ছিলো। তখনো পকেটে-পকেটে ঘোরে। সেটা কোল-এর হাতে এগিয়ে দিলুম।

অনেকক্ষণ ধ'রে কোল সেগুলো পড়লেন। বেশ মনোযোগ দিয়েই পড়লেন দেখলুম। পড়া শেষ হ'লে বললেন, 'দেখুন, ইংরিজি কবিতা লেখার চেষ্টাটা আপনার না-করাই ভালো। কারণ ইংরিজি শব্দের ধ্বনির কান আপনার মোটেই নেই।'

কথাটা শুনে আমার মনে যে বেশ-একটু অভিমান উথলে উঠেছিলো, সেটা স্বীকার করতে এখন কোনো লজ্জা নেই। পরে, অভিমানটা কেটে গেলে বিচার ক'রে বুঝেছিলুম, কোল-এর কথাটা খুবই ঠিক। তা নইলে গুরুদেবের আওতায় অমন গানের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হ'য়েও

দিকে একটা রংছুট লোহার খাট। খাটের কাছে একটা নড়বড়ে চেয়ার। তার পিঠে ঝুলছে শুঁয়োওঠা একটা কোট। খাটের উপর সর্বাঙ্গ ঢাকা দিয়ে শুয়ে একটা মানুষ।

মুখটা শুধু বের করা। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া কোঁকড়ানো চুল। সেই চুলের ফ্রেমে বসানো ছোট্টো একটি সুশ্রী মুখ। মুখের রংটা কিন্তু দারুণ ফ্যাকাসে। মুখ থেকে প্যাট্‌প্যাট্‌ বেরিয়ে আছে দুটো জলজলে নীল চোখ। দেখলেই বোঝা যায়, সে-দুটো চোখ এ-জগতের কিছু চায় না।

আমি বললুম, 'হা-ডু-ডু।' কোল বললেন, 'হা-ডু-ডু।' শিষ্টাচার সমাপ্ত হ'লো। তারপর দু-জনেই খানিক চুপ। প্রথম আলাপের স্বাভাবিক সংকোচ। ইংরিজি কেতায় এক আবহাওয়ার কথা পাড়া যেতে পারতো। কিন্তু কি জানি কেন মনে হ'লো, সে-কথাটা ওখানে বড্ডো বেয়াড়া বেখাপ্পা শোনাবে।

পকেট থেকে রীস-এর চিঠিটা বের ক'রে কোল-এর হাতে দিলুম। চিঠিতে কি লেখা ছিলো, সেটা আমার জানা। কারণ, ইংরেজরা পরিচয়পত্র দিয়ে, সেটা খামে পুরে এঁটে দেন না। খামটা খোলাই থাকে। তাই চিঠিতে কি আছে-না-আছে, সেই নিয়ে চুল ছিঁড়ে মাথা ঘামাতে হয় না।

কোল তখনো বিছানা ছেড়ে উঠছেন না দেখে, আমি মনে-মনে আঁচ করলুম, তিনি বোধ হয় অসুস্থ। আমি বললুম, 'অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলুম। আজ তা হ'লে উঠি। আর-একদিন না হয় আসবো।' —এই ব'লে আমি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠলুম।

কোল আমায় আবার বসতে বললেন। তারপর একটু ম্লান হাসি হেসে যা বললেন তার মর্মার্থ হ'লো এই : কোল-এর পায়জামা-স্যুট নেই। থাকবার মধ্যে আছে একটিমাত্র নেভী ব্লু রঙের স্যুট, যার কোটটা ওই চেয়ারের পিছনে ঝুলছে। কিন্তু তার প্যাণ্টুলুনটা আপাতত

হাতছাড়া। পন্‌শপে, অর্থাৎ পোদ্দারের দোকানে বাঁধা পড়েছে। সেটাকে যতোক্ষণ-না খালাস ক'রে ফিরিয়ে আনা যাচ্ছে ততোক্ষণ বিছানা ছেড়ে কোল-এর আর ওঠবার উপায় নেই।

আমি জানতুম, বিলিতি পন্‌শপে জুতো-জামা থেকে আরম্ভ ক'রে ঘড়ি ছড়ি আংটি চশমা সবই একাধারে বাঁধা দেওয়া চলে।

কোল আবার জানালেন, তিনি একটা প্রবন্ধ লিখে ডেলী নিউজ-এ ছাপবার জন্যে সেটাকে একটা মেসেঞ্জর বয়ের হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। ডেলী নিউজ তাঁর কবিতা প্রবন্ধ মাঝে-মাঝে ছাপেন। আর, তাঁর অবস্থা বুঝে দক্ষিণাটাও হাতে-হাতে অগ্রিম দিয়ে থাকেন। তিনি মনে করছেন, এই প্রবন্ধটার জন্যে এক গিনি পাওয়া যাবে। তার থেকে পাঁচ শিলিং দিয়ে পোদ্দারের দোকান থেকে প্যাণ্টুলুনটা ছাড়িয়ে নিয়ে মেসেঞ্জর বয় এখুনি এসে পড়লো ব'লে। আমি যেন ততোক্ষণ দয়া ক'রে একটু বসি।

'বিলক্ষণ।' —ব'লে আমি ধপ ক'রে আবার সেই চেয়ারেই ব'সে পড়লুম। স্বরচিত পঁচিশটা ইংরিজি কবিতা লেখা ঝকঝকে বাঁধানো খাতাটা আমার সঙ্গেই ছিলো। তখনো পকেটে-পকেটে ঘোরে। সেটা কোল-এর হাতে এগিয়ে দিলুম।

অনেকক্ষণ ধ'রে কোল সেগুলো পড়লেন। বেশ মনোযোগ দিয়েই পড়লেন দেখলুম। পড়া শেষ হ'লে বললেন, 'দেখুন, ইংরিজি কবিতা লেখার চেষ্টাটা আপনার না-করাই ভালো। কারণ ইংরিজি শব্দের ধ্বনির কান আপনার মোটেই নেই।'

কথাটা শুনে আমার মনে যে বেশ-একটু অভিমান উথলে উঠেছিলো, সেটা স্বীকার করতে এখন কোনো লজ্জা নেই। পরে, অভিমানটা কেটে গেলে বিচার ক'রে বুঝেছিলুম, কোল-এর কথাটা খুবই ঠিক। তা নইলে গুরুদেবের আওতায় অমন গানের আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হ'য়েও

আমি কেন গলা দিয়ে ছুটো নির্ভুল স্বর একসঙ্গে কখনো বের করতে পারি নি? এ-হেন আমার পক্ষে পদ্য লিখতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। তা সে কি বাংলায়, আর কি ইংরিজিতে।

তারপর চললো ইংরিজি কাব্যের আলোচনা। ইংরিজি শব্দতত্ত্বের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোল নতুন-পুরনো ইংরিজি কবিতার কোনোটার ছু-ছত্র, কোনোটার চার ছত্র, কোনোটার-বা আগাগোড়া সমস্ত একের-পর-এক আউড়িয়ে যেতে লাগলেন! কোল যে কোন্ রাজ্যে আছেন, তাঁর তখন আর খেয়াল নেই। তাঁর শাদা ফ্যাকাসে মুখে একটু গোলাপী আভা এসে গেছে। নীল চোখ ছুটো আরো স্বচ্ছ হ'য়ে উঠেছে।

হঠাৎ ঘরের সমস্ত দৈন্যকে ডুবিয়ে দিয়ে ছাপিয়ে উঠলো কাব্যলক্ষ্মীর এক অকিঞ্চন সেবকের অন্তরের গভীর প্রীতির এক অপূর্ব গৌরব। স্বরের আলোয় সমস্ত ঘরটা উছলিয়ে উঠলো। আমার সমস্ত চিত্ত ভ'রে ছন্দের ধ্বনি রিনিরিনি বাজতে লাগলো। কোল থামলেন। আমি স্থির। ঘর নিস্তব্ধ।

একটু স্বর নামিয়ে ছুঃখু ক'রেই কোল বললেন, 'আমরা ইংরেজ জাতটা কবিতার মর্ম বুঝি নে। তার উপযুক্ত মর্যাদাও দিই না। অথচ, আমরাই আজ পাঁচ শো বছর ধ'রে এক নাগাড়ে ইয়োরোপের সবচেয়ে সেরা কাব্য সৃষ্টি ক'রে এসেছি।'

আমি বললুম, 'মর্যাদা দেন না ভয়ে। আমার মনে হয়, ইংরেজরা মনের আনন্দকে প্রকাশ করতে ভয় পান। ভাবেন, তাতে ক'রে বুঝি মনের দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়ে যাবে।'

খানিক ভেবে কোল বললেন, 'আপনার কথাটা বোধ হচ্ছে ঠিক।'

আলোচনায় বাধা পড়লো। দরজায় কে যেন নক্ করলো। কোল বললেন, 'কম্ ইন্।'

ডিষ্ট্রিক্ট মেসেঞ্জারের উর্দি-পরা এক ছোঁড়া এসে ঘরে ঢুকলো। তার এক হাতে পাট-করা এক প্যাণ্টুলুন, আর-এক হাতের মুঠির ভেতর থেকে দেখা যাচ্ছে, একটা নোট, ক'টা রুপোর টাকা আর ক'টা তামার পয়সা।

আমার কবিতার খাতাটা কোল-এর বিছানা থেকে তুলে নিয়ে আমি আস্তে-আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। দক্ষিণার কথা উঠিয়ে কোল-কে অপমান করবার সাহস হ'লো না।

টেডী কোল-এর সঙ্গে এর পরে অনেক বার দেখা-সাক্ষাৎ। প্রথম আলাপ ক্রমশ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিলো। কোল-এর আর্থিক অবস্থা আর ফিরলো না। শরীরও ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'তে লাগলো। আমি দেশে ফেরবার আগেই শুনলুম, ডাক্তাররা কোল-এর বুকের মধ্যে যক্ষ্মার মারাত্মক ছাপ দেখতে পেয়েছিলেন।

দেশে ফিরে আসবার ক'মাস পরেই খবর পেলুম, টেডী কোল আর ইহজগতে নেই। মাত্র ছাব্বিশ বছর বয়েসেই তিনি মারা গেলেন।

কিন্তু সেদিনকার সেই প্রথম আলাপের কথাটা আজো বেশ স্পষ্ট মনে আছে।

ইয়েট্‌স

কৌশলে ইয়েট্‌সের কথাটা রোটেনস্টাইনের কাছে পাড়তেই তিনি ফস্‌ ক'রে একখানা ভিজিটিং কার্ড বের ক'রে তারই উপর খস্‌খস্‌ ক'রে লিখে ফেললেন— টু ইন্‌ট্রোডিউস মিস্টার টি. চ্যাটার্জি। কার্ডের অপর পৃষ্ঠায় লিখলেন— টু ডব্‌লিউ. বি. ইয়েট্‌স এস্কুয়্যার। তারপর কার্ডটা আমার হাতে দিয়ে জানিয়ে দিলেন, ইয়েট্‌স এখন নটিং হিল গেটে একটা ফ্ল্যাটে থাকেন।

ঠিকানাটা আমি নোটবুকে টুকে নিলুম।

বাড়ি ফিরে এসে রোটেনস্টাইনের দেওয়া কার্ডটা সঙ্গে দিয়ে, 'ইয়েট্‌সকে এক চিঠি লিখে ডাকে ফেলে দিলুম। তারপর দিন যায়, ক্ষণ যায়, কিন্তু আমার চিঠির কোনো উত্তর আর আসে না। আমি বুঝলুম, ভাগ্য খারাপ। ইয়েট্‌সের সঙ্গে বুঝি এ-যাত্রা আর দেখাই হ'লো না।

ইয়েট্‌সের কথাটা মন থেকে ঝেড়ে ফেলবার উপক্রম করছি, এমন সময়— প্রায় দিন কুড়িক পরে— হঠাৎ তাঁর কাছ থেকে এক পোস্টকার্ড এলো। তিনি জানাচ্ছেন, পরশু দিন বিকেল সাড়ে চারটের সময় আমি তাঁর ওখানে গেলে তিনি খুশি হবেন।

নটিং হিল গেট আমার জানা পাড়া। লণ্ডনে আমি যেখানে থাকি সেখান থেকে বেশি দূর নয়। এই পোয়াটাক রাস্তা হবে। মাইলটাক গিয়েও যে-রাস্তা পোয়াটাক হয় না, এ সে-রকম পাকী পোয়া নয়। সত্যিসত্যিই সিকি মাইলের মধ্যে। আমাদের বাড়ির সামনেই বড়ো রাস্তা— কেনসিংটন হাই স্ট্রীট। সেই রাস্তার বাঁ-দিক ধ'রে খানিকটা হেঁটে

গেলেই কেনসিংটন চার্চ পড়ে। তারপর আর সোজা না গিয়ে ডাইনে বেঁকলেই নটিং হিল গেটের পথ শুরু হ'লো।

নম্বর মিলিয়ে ইয়েট্সের বাড়ি খুঁজে পেতে বেশি দেরি হ'লো না। ইয়েট্সের ফ্ল্যাট দোতলায়। ঢুকতেই সামনে একটুখানি বারাণ্ডা-গোছের জায়গা। সেখানে একটা মস্ত খাঁচা সিলিং থেকে ঝুলছে। খাঁচার ভিতর একপাল ছোটো-ছোটো ক্যানেরি পাখি। তারা একবার উঠছে একবার দাঁড়ে বসছে, আবার উড়ে অন্য আর-এক দাঁড়ে যাচ্ছে।

ঘণ্টা টিপতে দাসী এসে ফ্ল্যাটের দরজা খুলে দিলো।

দাসীকে অনুসরণ ক'রে ড্রয়িং রুমে পৌছনো গেলো। ঘরটা একটু বিচিত্র রকমের। সেখানকার সবই কালোয় কালো। ঘরের দেওয়ালগুলো কালো কাগজে মোড়া। কেবল মাথার দিকে একটু সরু রুপোলি পাড় ছুঁয়ে গেছে মাত্র। ফ্লোরজোড়া কালো কার্পেট। তারও দু-ধারে খানিক রুপোলি আঁচলা। টেবিল চৌকি সোফা কৌচ ক্যাবিনেট্, সবই কালো আবলুস কাঠের। দরজা-জানলার পর্দাগুলোও কালো। মাঝখানে শুধু গ্রে রং-এর রেশমের ফোঁড়ে জিওমেট্রির নক্সা তোলা। কোনোটা গোল, কোনোটা চতুষ্কোণ, কোনোটা আবার ত্রিভুজ। কোনোটায় স্বস্তিক চিহ্ন।

ঘরে ইলেক্‌ট্রিক লাইট জ্বলছে না। জ্বলছে, চারদিকে চারটে টেবিলের উপর ব্রঞ্জের বাতিদানে দুটো ক'রে মোমবাতি।

আমায় এক মিনিট বসতে ব'লে দাসী ভিতরে গেলো। মিনিট দুয়েক পরেই ইয়েট্স স্বয়ং এসে আমার সামনে দাঁড়ালেন। হ্যাঁ, চেহারা বটে একখানা। ভিড়ে গুলিয়ে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। বরং একরাশ লোকের মাঝখানে ইয়েট্সকে দেখলে লোকে পাঁচবার জিগ্যেস করবে, মানুষটা কে বটে হে?

ইয়েট্‌সের মতো অমন সুপুরুষ কি স্বদেশে কি বিদেশে কোথাও আমার চোখে পড়ে নি, তা কি এর আগে আর কি এর পরে। যেমন লম্বা তেমনি মানানসই চওড়া ব্যক্তি। নাক মুখ চোখ কাটা-কাটা নক্সা করা। তার উপর চেহারায় বেশ-একটু কবি-কবি ভাব। সেটা বোধ হয় চুল রাখবার ধরনে। সাধারণত সাহেবসুবোরা ছোটো ক'রেই চুল ছাঁটেন। সে-তুলনায় ইয়েট্‌সের মাথার চুলকে বাবরি বললেও চলে। ডান-দিককার চুল পেটো পাড়ানো। একেবারে কানের উপর এসে পড়েছে। কালো ভেল্‌ভেটিনের স্যুটে ইয়েট্‌সকে মানিয়েছে ভালো। গলায় টাই-এর বদলে কালো সিল্কের এক বড়োগোছের বো।

ইয়েট্‌সকে আসতে দেখে আমি দাঁড়িয়ে উঠেছিলুম। তিনি কাছে আসতেই বুঝলুম, আমি কতো বেঁটে। তাঁর কাঁধ পর্যন্ত পৌছলুম না।

ইয়েট্‌স বললেন, 'আপনি তো ব্রাহ্মণ, শেক্‌হাণ্ড বোধ হয় করবেন না।'

আমি আশ্চর্য হ'য়ে বললুম, 'ব্রাহ্মণকুলে আমার জন্ম বটে, সেটা আমি অস্বীকার করতে পারি নে। কিন্তু শেক্‌হাণ্ড করতে আমার কোনো বাধা নেই।' —এই ব'লে ডান-হাতটা বাড়িয়ে দিলুম। ইয়েট্‌সের প্রকাণ্ড মুঠোর মধ্যে আমার ছোটো হাতটা কোথায় যে তলিয়ে গেলো। একটু মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে ইয়েট্‌স আমার হাতটা নামিয়ে দিলেন।

কালো একটা ট্রে-র উপর বসানো চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে দাসী ঘরে ঢুকলো। অবাক কাণ্ড! পেয়ালা পিরিচ চা-দানি দুধ-দানি এমন কি কোয়ার্টার প্লেট ইস্তক সবই যে কালো রঙের! শাদার মধ্যে শুধু রুপোর চামচ আর দস্তার ছাঁকনি। রকমসকম দেখে আমার মুখে আর কথা জোগায় না। নিঃশব্দে চা খেয়ে যেতে লাগলুম। ইয়েট্‌সও চুপ ক'রে আছেন। তাকিয়ে দেখি, তাঁর চোখের চাহনি কোন্ সুদূরে চ'লে গেছে।

খানিক পরে ইয়েট্সের যেন চমক ভাঙলো। অস্বস্তিকর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে তিনি বললেন, 'বহুকাল আগে এক ব্রাহ্মণের কাছ থেকে উপদেশ নেবার সুযোগ আমার ঘটেছিলো। সে অনেক দিন আগে। তখন আমার বয়েস এই সতেরো কি আঠারো হবে। আমি তখন ডাব্‌লিনে থাকি। ছবি আঁকি, আর নানা দেশের সাধুসন্তদের বাণী মনোযোগ দিয়ে পড়ি। আমরা ক'জন বন্ধু মিলে এক সভা বসাতুম। আর, সংসারে এমন বিষয়বস্তু ছিলো না, যা নিয়ে সেখানে আমরা তর্ক না বাধাতুম। সভার নাম রেখেছিলুম, হার্‌মিটিক সোসাইটি।

'একদিন শোনা গেলো, থিয়জফিস্ট মাদাম ব্লাভাট্‌স্কির সঙ্গে এক পণ্ডিত ব্রাহ্মণ ভারতবর্ষ থেকে লণ্ডনে এসেছেন। আমরা তাঁকে ডাব্‌লিনে এসে আমাদের সঙ্গে কিছুদিন থাকবার জন্যে নেমন্তন্ন ক'রে পাঠালুম। আমাদেরই এক মেম্বরের গোটা-দুয়েক ঘর নেওয়া ছিলো। তারই একটাতে তাঁর থাকবার বন্দোবস্ত করা হ'লো। তিনি এলে আমরা সকলে মিলে তাঁকে ছেঁকে ধরলুম।

'আমার মনে-মনে যীশু খ্রীস্টের যে-ছবি আঁকা ছিলো, সেই ব্রাহ্মণের চেহারার সঙ্গে সেটা হুবহু মিলে গেলো। তাঁর চোখে দেখেছিলুম, খ্রীস্টের মতোই অপার করুণা, আর সেই সঙ্গে একাধারে অসীম বেদনা। আমি প্রতিদিনই তাঁর কাছে সকাল থেকে গিয়ে বসতুম। কখনো অন্যের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা স্থির হ'য়ে শুনতুম, কখনো প্রশ্নের-পর-প্রশ্ন ক'রে তাঁকে অস্থির ক'রে তুলতুম। কিন্তু বালক ব'লে তিনি আমাকে কখনো অবজ্ঞা করেন নি। হাসিমুখেই আমার সব প্রশ্নেরই উত্তর দিয়ে যেতেন।

'আমি চিরকালই এই দৃশ্যমান জগতের ঊর্ধ্বে অবস্থিত এক মায়াপুরীর সন্ধানে ঘুরে বেড়িয়েছি। কিন্তু সে-সম্বন্ধে আমার ধারণা তখন খুবই অস্পষ্ট ছিলো। এই ব্রাহ্মণের সংস্পর্শে এসে সেটা খানিক দানা

বাঁধতে পেরেছিলো। আমাদের দেশের ভাবধারার সঙ্গে তাঁর পরিচয় থাকার দরুন তিনি প্রাচ্য দেশের ভাব পশ্চিম দেশের ইডিয়মে বেশ বুঝিয়ে ব'লে যেতে পারতেন। এইজন্যে তাঁর কাছ থেকে অনেক দুরূহ গভীর কথা জেনে নিতে আমার ততো কষ্ট হ'তো না।

'এর অল্প পরেই আমরা লণ্ডনে বাস করতে এলুম। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও সেই সময় লণ্ডনে অ্যারানডেলদের বাড়িতে বাস করছেন। অনেক নামজাদা সাহিত্যিক দার্শনিক বৈজ্ঞানিক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তবে তাঁরা কেউই আমার মতো অর্বাচীন ছিলেন না। তাঁরা ভারী-ভারী জ্ঞানের কথাই পাড়তেন।' এইখানে ইয়েট্‌স একটু থেমে বললেন, 'খুব বেশি বোরিং ব'লে মনে হচ্ছে না তো?' আমি সজোরে মাথা নেড়ে 'না' বলাতে, তিনি আবার কথা আরম্ভ করলেন।

বললেন, 'আমি গোড়ায়-গোড়ায় ভারতবর্ষীয় বিষয় নিয়ে কতক কবিতা রচনা করেছিলুম। তাতে কিছুটা সেই ব্রাহ্মণের উপদেশের প্রভাব আছে। কিন্তু সেগুলো শেষ পর্যন্ত ঠিক কবিতা হ'য়ে দাঁড়ায় নি। কারণ, তখনো আমি আমার নিজের মনের ভাষা খুঁজে পাই নি। সেই সময় অনসূয়া ও বিজয় নাম দিয়ে একটা পুরো কাব্যনাট্য লেখাও মনস্থ করেছিলুম, কিন্তু সেটা এক অঙ্কের বেশি আর অগ্রসর হয় নি।'

এইবার আমি বললুম, 'আপনার অন্যান্য কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় না থাকলেও আপনার দুটো কবিতা আমার মুখস্থ আছে।' —এই ব'লে আমি ইয়েট্‌সের দি লেক্ আইল্ অভ্ ইনিস্‌ফ্রি আর ওয়েন ইউ আর ওল্ড ইত্যাদি দুটো কবিতা গড়গড় ক'রে আবৃত্তি ক'রে গেলুম।

সাত হাজার মাইল দূর থেকে আগত একেবারে অজ্ঞাত এক বিদিশি ছোকরার মুখে নিজের কবিতা আওড়ানো শুনে ইয়েট্‌স প্রথমটা একটু থমকে গেলেন। তারপর দেখলুম, তাঁর মুখটা খুশিতে ভ'রে উঠছে।

ধীরে-ধীরে তিনি বললেন, 'স্থরের ভাষা এমনি অদ্ভুত জিনিস যে, দূরের লোককেও কতো কাছে টেনে আনে।'

তারপর আবার অন্যমনস্ক হ'য়ে কি যেন ভাবতে লাগলেন।

মিনিট দুয়েক পরে হঠাৎ সজাগ হ'য়ে ইয়েট্স বললেন, 'কি বলছিলুম যেন? হ্যাঁ, সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা। তিনি কারুর অঙ্গ স্পর্শ করতেন না। কারুর সঙ্গে কখনো শেকহ্যাণ্ড করতেন না। কিন্তু একবার বিধাতা বাম হ'য়ে তাঁকে বড়োই জব্দ করেছিলেন। সে-ঘটনা ঘটে নেপল্সে। সকলে ভিস্থভিয়স আগ্নেয়গিরি দেখতে গেছেন। সঙ্গে আছেন বিখ্যাত বেহালা-বাদক ওলী বুল, তাঁর স্ত্রী মিসেস বুল, আরো জনকয়েক স্ত্রীলোক ও পুরুষ।

'একটি স্ত্রীলোক ভিস্থভিয়স পাহাড়ের গর্তের ভিতর কি আছে দেখবার কৌতুকে একগলা মুখ বাড়িয়ে যেই সেদিকে ঝুঁকেছেন, সেই টাল খেয়ে গহ্বরের মধ্যে প্রবেশ করেন আর-কি। ব্রাহ্মণ ঠিক তাঁর পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। মেয়েটিকে পড়ো-পড়ো দেখে তাঁর দু-পা খপ ক'রে জড়িয়ে ধ'রে তাঁকে গর্তর মুখ থেকে টেনে তুললেন।

'তারপর যা ঘটলো, তা আর বলবার নয়। ভদ্রমহিলা কোথায় প্রাণরক্ষা করার জন্যে ব্রাহ্মণকে ধন্যবাদ দেবেন, তা নয়। তিনি সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে গালাগালির তুবড়ি ছুঁড়লেন। চিৎকার ক'রে ব'লে যেতে লাগলেন— তুমি আচ্ছা বেল্লিক তো হে? আমি ম'রে যেতুম তো যেতুম। তুমি কি আক্কেলে এই একগাদা পুরুষমানুষের সামনে শুধু আণ্ডারওয়্যার-পরা আমার আঢাকা পা-দুটো হাঁটু পর্যন্ত খুলে দেখালে? এর চেয়ে যে মরা আমার ঢের ভালো ছিলো।

'তখনকার দিনের ইয়োরোপীয়ন মেয়েদের স্কার্ট হাঁটু পর্যন্ত ওঠে নি। একেবারে জুতোর তলা তক্ নামানো থাকতো। পায়ের গোড়ালিটুকুও দেখা গেলে, সে এক মহাপাপ!'

গল্প শুনে আমি খুব একচোট হেসে নিলুম।

ইয়েট্স আবার একদম চুপ।

এইবার আমি উঠলুম। অনেকক্ষণ এসেছি। আর বসলে ভদ্রতা রক্ষা হয় না। দাঁড়িয়ে উঠে এবার আর শেক্হ্যাণ্ড করলুম না। আমাদের দিশি প্রথায় হাতজোড় ক'রে ইয়েট্সকে নমস্কার জানালুম।

বাইরে বেরুতেই দেখি, বারাণ্ডায় ক্যানেরির খাঁচা লক্ষ্য ক'রে থাবা পেতে ব'সে আছে এক কালো কুচকুচে বেড়াল। আগাগোড়া কালো। তার গায়ের কোথাও একটু অন্য রঙের ছোঁয়া পর্যন্ত নেই। কেবল চোখ দুটো ছোট্টো-ছোট্টো দুই সবুজ বাল্বের মতো জ্বলছে।

নিশ্চয়ই কারুর পোষা বেড়াল। আমায় বেরুতে দেখে বেড়ালটা এগিয়ে এসে আমার প্যাণ্টুলুনে গা ঘষতে লেগে গেলো। আমি ভাবলুম, এবার হয়েছে। যতো সব অলক্ষুণে কাণ্ড! একটা ভারী বিপদ শিগ্গিরই ঘাড়ে এসে চাপলো ব'লে।

কিন্তু শেষপর্যন্ত বিপদ কিছু ঘটে নি। তখন কি অতো জানি যে, বিলিতি মতে মিশমিশে কালো বেড়াল কৃষ্ণের এক অতি পয়মন্ত জীব!

এর পর আর কখনো ইয়েট্সের সঙ্গে দেখা হয় নি। এর ক'দিন বাদেই শরীর অসুস্থ ব'লে তিনি দক্ষিণ ফ্রান্সে হাওয়া বদলাতে চ'লে গেলেন। আমারও বিলেতের কাজ সারা হয়েছিলো। দেশে ফিরতে হ'লো।

দেশে ফিরে এসে কর্তাকে ইয়েট্সের কথা বলাতে তিনি বললেন, 'ইয়েট্স ছেলেবয়েসে আমার কাছে ঘন-ঘন আসতেন বটে। মাদাম ব্লাভাট্স্কি যখন হল্যাণ্ড পার্কে বাড়ি নিয়ে বাস করতেন তখন তাঁরও কাছে ইয়েট্সের খুবই যাতায়াত ছিলো।'

দেশে ফেরার বছর দুই পরে বিলেত থেকে আমার নামে একটা খাম এলো। আমাদের লণ্ডনের ফ্ল্যাট থেকে মিসেস ফ্লেচর রিডাইরেক্ট ক'রে পাঠিয়েছেন। খাম ছিঁড়ে দেখি, তার মধ্যে ইয়েট্‌সের কাছ থেকে আসা টাইপ-করা এক কবিতা :

Mohini Chatterjee

I asked if I should pray,
But the Brahmin said,
'Pray for nothing, say
Every night in bed,
"I have been a king,
I have been a slave,
Nor is there anything,
Fool, rascal, knave,
That I have not been,
And yet upon my breast
A myriad heads have lain." '

That he may set at rest
A boy's turbulent days
Mohini Chatterjee
Spoke these, or words like these.
I add in commentary,
'Old lovers yet may have
All that time denied—

Grave is heaped on grave
That they be satisfied—
Over the blackened earth
The old troops parade,
Birth is heaped on birth
That such cannonade
May thunder time away,
Birth-hour and death-hour meet,
Or, as great sages say,
Men dance on deathless feet.'

ছবি কেনা

লরেন্স বিনিয়ন্-এর সঙ্গে যে কি সূত্রে প্রথম পরিচয় ঘটেছিলো, তা এখন আর আমার মনে পড়ছে না। তবে তাঁর কাছে বার-বার আসা-যাওয়ার ফলে তাঁর সঙ্গে কিছুটা ঘনিষ্ঠতা হয়েছিলো।

বিনিয়ন্-এর বেশ প্রশান্ত প্রসন্ন মুখ। ঠোঁট দুটোয় একটু মজা ছিলো। তাতে সর্বদাই একটু মৃদু-মন্দ হাসি লেগেই আছে। সে-হাসি যেন সর্বদাই জানান দিতে চায়, মানুষের বেকুবির আর অন্ত নেই।

লরেন্স বিনিয়ন্-এর একটা সরকারী কাজ ছিলো। ব্রিটিশ মিউসিয়ম্-এ প্রাচ্যদেশের যে-সব ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ আছে, সে-সবের হেফাজত করা। তিনি সেই ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটি কীপার্। তাঁর বেসরকারী কাজ, কবিতা লেখা আর আর্টের বই ছাপানো।

বিনিয়ন্ ছেলে বয়েস থেকেই কবিতা লিখছেন। বলেছিলেন, সেকালে তাঁদের একটা ক্লাব ছিলো। তার নাম রাইমার্স ক্লাব। অর্থাৎ পদ্য-লিখুড়েদের আড্ডা। লণ্ডনে ফ্লীট্ স্ট্রীটের চেশার চীজ্ ব'লে বিখ্যাত রেস্তোরাঁয় সেই আড্ডা বসতো। পুরাকালে ডক্টর জন্সন তাঁর শিষ্যবর্গ নিয়ে এইখানেই আড্ডা জমাতেন।

ক্লাবের তেরো জন মেম্বর ছিলেন। কিন্তু সব ক'জনের নাম শুনি নি। শুনলেও, ভুলে গেছি। এই দলে তখনকার দিনের অনেক কবি ছিলেন, যাঁদের নাম এখনকার দিনের খুব কম লোকেই জানেন।

এই গ্রুপের লায়নেল জন্সন, স্টীফ্ন ফিলিপ্স, আরনেস্ট ডাওসন, আরনেস্ট রীস, জন্ ডেভিড্সন, আর্থার সিমন্স— এঁদের কাব্য কে আর

এখন পড়ে ? দু-চারটে টুকরো-টাকরা কবিতা কাব্য-সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায় মাত্র।

কিন্তু আমাদের কিছু পূর্ববর্তীদের মধ্যে তখন যাঁদেরই ইংরিজি কাব্যে কিছুটা দখল ছিলো, তাঁদের মুখে-মুখে ফিরতো ডাওসন্-এর সায়নারা, ডেভিড্সন-এর হলিডে, স্টীফ্ন ফিলিপ্স-এর মার্পেসা ইত্যাদি। শুনে-শুনে আমাদেরও কম্সে-কম দু-চার লাইন ক'রে মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিলো।

এঁদের অনেকেই জীবনের উপর বিতৃষ্ণ হ'য়ে মদ-ভাঙ খেয়েই হোক কি আত্মহত্যা ক'রেই হোক, অল্প বয়েসেই জীবন শেষ করেছিলেন। বেঁচে থাকলে তাঁদের হাত দিয়ে যে-কবিতা বেরুতো তাতে ইংরিজি কাব্য যে অনেকটা পরিপুষ্ট হ'তে পারতো, সেটা অনুমান করতে কিছুমাত্র কষ্ট পেতে হয় না।

যাঁরা এই ঘোর হতাশার হাত থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে বেরোতে পেরেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উইলিয়ম বাট্লার ইয়েট্স-এর নাম সবাই জানেন। তাঁর লেখা ইনিস্ফ্রি কবিতাটি কে না একাধিকবার পড়েছেন ? যতোদিন ইংরিজি ভাষা জীবিত থাকবে, ততোদিন সুর আর ভাবের অপূর্ব সমাবেশে লেখা এই লিরিক ইংরিজি কাব্যরসিকদের মনে আনন্দ সঞ্চার ক'রে যাবে।

আরনেস্ট রীস কবিতা লেখার চেয়ে কাব্য-সমালোচনা আর কাব্যগ্রন্থ সম্পাদনার কাজে ঢের বেশি কেরামতি দেখিয়েছেন। আর্থার সিমন্স-এরও কবিতার চেয়ে সাহিত্য-সমালোচনা আরো অনেক উপাদেয়। লরেন্স বিনিয়ন্-এর কবিতা অনেকের ভালো লাগলেও আমার কাছে কি-রকম যেন পান্সে-পান্সে ঠেকে। কাঠামোটা বেশ ছিমছাম পরিপাটি। টেক্নিকও উঁচু দরের। তবু কেমন যেন তার মধ্যে প্রাণের আবেগ নেই।

আসল কথা, বিনিয়ন্ মন দিয়ে কবিতা লিখেছেন, প্রাণ দিয়ে নয়। তাঁর আর্টের উপর বইগুলো আমার কাছে আরো বেশি মনোজ্ঞ।

এই দলে এককালে এক বাঙালী কবিও ছিলেন। তিনি মনোমোহন ঘোষ। শ্রীঅরবিন্দের বড়ো ভাই। লরেন্স বিনিয়ন্ বলতেন, মনোমোহন সত্যিকারের কবি। জীবিকা উপায়ের জন্যে তাঁকে চাকরি নিয়ে ও-দেশ ছেড়ে চ'লে যেতে হ'লো— সেইটেই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি।

আরো বলতেন, দীর্ঘকাল ও-দেশে না থাকায়, মনোমোহন ইংরিজি কবিতার ভাষা ভুলতে বসেছিলেন। আর ওদিকে বাংলা ভাষা না জানার দরুন তাঁর অতো বড়ো কাব্যশক্তি মাতৃভাষাতেও প্রকাশ ক'রে প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারলেন না। কথাটা অনেকটা সত্যি ব'লে মনে হয়। ইংল্যাণ্ড থেকে দূরে স'রে থেকে ইংরিজি গদ্য একরকম ভদ্রভাবে লেখা যেতে পারে, কিন্তু ইংরিজি পদ্য কিছুতেই আর তেমন জুতসই হ'তে চায় না। কারণ, ও-দেশের কাব্যজগতে কথার মূল্য শেয়ার-মার্কেটের মতো ক্রমাগতই উঠছে-পড়ছে।

মনোমোহন ঘোষ আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজে শেলী, ব্রাউনিং আর স্বইন্‌বার্নের কাব্যের পাঠ দিয়েছিলেন। হ্যাঁ, মনে হ'তো বটে কবিতা পড়ছি। তাতে এগজামিন পাসের বড়ো স্থবিধে হয় নি। কিন্তু যা রস পাওয়া গিয়েছিলো তার আনন্দে আমার মন এখনো ভরপুর।

মনোমোহন ঘোষ আমাদের বাড়ির খুব কাছেই এলিয়ট্ রোডে থাকতেন। মাঝে-মাঝে এক-এক সন্ধ্যায় হঠাৎ দমকা হাওয়ার মতন আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়তেন। তারপর ঠিক মুডে থাকলে, ঘণ্টার-পর-ঘণ্টা ইংরিজি কাব্য নিয়ে আলোচনা ক'রে যেতেন। খাওয়া-দাওয়ার হুঁশ থাকতো না।

রাইমার্স ক্লাবের সদস্যদের গুরুর সামিল ছিলেন অস্কার ওয়াইল্ড।

ক্লাবের মেম্বরদের উপর তাঁর প্রচণ্ড প্রভাব। অস্‌কার ওয়াইল্ড যে বড়ো দরের কবি, তা কেউ বলবেন না। তাঁর গদ্যগ্রন্থগুলো আরো উঁচু স্তরের। কিন্তু অস্‌কার ওয়াইল্ড তাঁর এই-সব অর্বাচীন ভক্ত শিষ্যদের একটা অ্যাটিচিয়ুড-এর নেশা ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সে-ভঙ্গিটার ভালো-মন্দ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেন। মোদ্দা কথা, এইটুকুই নিশ্চিত বলা যেতে পারে যে, সে-অ্যাটিচিয়ুড সকলের সহ্য হয় নি।

অস্‌কার ওয়াইল্ডের উপস্থিত বুদ্ধি আর চট ক'রে পাল্টা জবাব শুনিয়ে দেবার ক্ষমতা সম্বন্ধে এক চমৎকার গল্প শুনলুম। লেডী স্ট্যানলী সেকালের লণ্ডনের এক বিখ্যাত হোস্‌টেস। সার্‌ হেনরী স্ট্যানলীর স্ত্রী। সেই হেনরী স্ট্যানলী, যিনি অ্যাফ্‌রিকার ঘোর অন্ধকার বনজঙ্গল থেকে লিভিংস্টোনকে খুঁজে বের করেছিলেন।

লেডী স্ট্যানলী নিজে জ্ঞানীগুণী। আর তাঁর বাড়িতেও জ্ঞানীগুণীদের বিশেষ সমাদর। লণ্ডনের বিখ্যাত-বিখ্যাত লোকদের সদাসর্বদাই তাঁর বাড়িতে সমাগম। এর উপর, লেডী স্ট্যানলী নিজে আর্টিস্টও ছিলেন। তাঁর আঁকা দি ফার্স্ট অফেন্‌ডার ছবিটা এখন বোধ হয় ন্যাশনল গ্যালারিতে স্থান পেয়েছে।

অস্‌কার ওয়াইল্ড তখন ইংরেজ লেখকসমাজে একটা কেষ্ট-বিষ্টু। লণ্ডন সোসাইটির একটা দিক্‌পাল বললেই চলে। একদিন স্ট্যানলীদের বাড়িতে তাঁর ডিনারে নেমন্তন্ন হয়েছে। সময় ব'য়ে যায়, কিন্তু অস্‌কার ওয়াইল্ডের আর দেখা নেই। আটটা গেলো, সাড়ে আটটা গেলো, ন'টা বাজে-বাজে। খিদেয় সকলের পেট চুঁইচুঁই করছে। শেষে আর থাকতে না পেরে সবাই ডিনার টেবিলে ব'সে পড়লেন।

খাওয়া চলেছে, এমন সময় পরম নির্বিকার চিত্তে হেল্‌তে-দুল্‌তে অস্‌কার ওয়াইল্ড এসে ডাইনিং রুমে প্রবেশ করলেন। মেয়েদের যেমন

কাণ্ড, সোজাসুজি খেতে বসিয়ে না দিয়ে লেডী স্ট্যানলী দেরির জন্যে অস্কার ওয়াইল্ডকে বিষম তাঁইস শুরু ক'রে দিলেন।

অস্কার ওয়াইল্ড চারদিক চেয়ে একটু হেসে জবাব দিলেন, 'লেডী স্ট্যানলী ম্যাডাম, ঘড়ি দেখে কি কেউ সূর্যের গতি নির্ণয় করে? না, সূর্যের গতি দেখেই লোকে ঘড়ি ঠিক করে?' জবাব শুনে তো ঘরসুদ্ধ লোক একেবারে চুপ! লেডী স্ট্যানলীর মুখে আর সাড়াশব্দ নেই।

একদিন বিনিয়ন্ আমাকে লাঞ্চে ডেকেছেন। ব্রিটিশ মিউসিয়ম্-এর কম্পাউণ্ডের মধ্যেই একটা আলাদা ছোটো দোতলা বাড়িতে তখন লরেন্স বিনিয়ন্-এর বাসস্থান। খানিকটা আগেভাগেই গিয়েছিলুম। বিনিয়ন্-এর মুখে কথাবার্তা শোনবার জন্যে। বিনিয়ন্ বেশি কথা বলেন না। কিন্তু যেটুকু বলেন, তার সবটাই সারবস্তু।

একথা-সেকথার পর আলাপটা গিয়ে পড়লো ইণ্ডিয়ান আর্টের উপর। তখন সম্প্রতি বিনিয়ন্ আমাদের মুকুল দে-র কপি-করা অজন্তা আর বাঘ-গুহার ক'খানা ছবি ব্রিটিশ মিউসিয়ম্-এর জন্যে কিনেছেন। মুকুলচন্দ্র সেই সবে লণ্ডন শহরে গিয়ে পৌছিয়েছেন।

বিনিয়ন্ বললেন, 'তোমাদের প্রাচীন আর্টিস্টদের কী চোখ! যা দেখতেন, তা আর কস্মিনকালে ভুলতেন না। তারপর তাই হুবহু মন থেকে দেওয়ালে এঁকে গেছেন। হাত কি! ওই অন্ধকার গুহার মধ্যে ব'সে মশাল জ্বালিয়ে দিনের-পর-দিন এঁকে গেছেন। কোথাও একটুকুও হাত কাঁপে নি। কোথাও একটুকুও লাইন বাঁকে নি। কোথাও কোনো ভুল-চুক নেই। আর রঙেরই বা কী সূক্ষ্ম জ্ঞান! ক'টাই বা রং ব্যবহার করেছেন! কিন্তু কোথাও কোনোটা একটুও বেমানান হয় নি।'

এই ব'লে বিনিয়ন্ থেমে গেলেন। আমি কিছুই বলছি নে, তিনিই কেবল কথা ক'য়ে যাচ্ছেন দেখে তাঁর যেন একটু লজ্জিত ভাব। আমি

তবুও মুখ খুললুম না। ও যে অতি গভীর জল। ওখানে কি ধরাছোঁয়া দিতে আছে? ওখানে মুখ খুললে যে নাকানি-চোবানি খেতে হবে। সংস্কৃত বচনটাও মনে ছিলো— কারুর-কারুর ততোক্ষণই শোভাবর্ধন হয়, যতোক্ষণ না তিনি মুখ খুলছেন। আমি বিজ্ঞের ভান ক'রে দেওয়ালের দিকে মুখ ক'রে রইলুম। বিনিয়ন্-এর মুখে সেই মৃদু হাসি।

খানিক পরে বিনিয়ন্ নিজেই ব'লে গেলেন, 'রাজপুত ছবিতে, মোগল ছবিতে, এমনকি তোমাদের ফোক্-আর্টেও বাস্তব জীবনের সঙ্গে কোথাও ছাড়াছাড়ি নেই। প্রাচীনকালের ছবির মতন আকারে ততো বড়ো না হ'লেও আর তার মতো অতো বৈচিত্র্যময় না হ'লেও, তারই মতো লাইফ্ থেকে নেওয়া। কিন্তু তোমাদের এখনকার আর্টিস্টদের দেখি, কেমন যেন লাইফ্ থেকে ছাড়ো-ছাড়ো ভাব। লাইফ্-এর ত্রিসীমানায় তাঁরা ঘেঁষতে চান না।'

আমি আর নিজেকে চাপতে পারলুম না। নিতান্ত বোকার মতো রিমার্ক পাস ক'রে বসলুম, 'জীবনটাকে আপনারা ইয়োরোপীয়নরা এমন একান্তভাবে আঁকড়িয়ে ধ'রে আছেন যে, তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে যেতে আমাদের কেমন লজ্জা বোধ হয়। তাই আমাদের এখনকার আর্টিস্টরা পৌরাণিক কিংবা ঐতিহাসিক সাব্জেক্ট নিয়েই সন্তুষ্ট আছেন। তাঁদের ভয়, আপনাদের আর্টিস্টদের মতো লাইফ্ নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে গেলেই আপনারা ব'লে বসবেন, ওটা চুরিবিদ্যে। দেখুন না কেন, গুরুদেব যখন ইংরিজিতে গীতাঞ্জলি প্রকাশ করলেন তখন আপনাদেরই তো কোনো-কোনো মনীষী ক্রিটিক ব'লে উঠলেন, ওঁর ভাষাটা বাইবল থেকে নেওয়া, আর ভাবটা ক্রীশ্চান মিশনরিদের কাছ থেকে পাওয়া।'

বিনিয়ন্-এর মুখে আবার সেই হাসি। ক্রিটিকদের কথা ভেবে? না, আমারই বেকুবি দেখে?

আলোচনাটা বেশ জ'মে উঠেছে, এমন সময় দরজায় টোকা মেরে এক দাসী এসে ঘরে ঢুকলো। ভিতরে এসে জানালো, দুটি বিদিশি ভদ্রলোক দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে। তাঁরা মাস্টার-এর সঙ্গে দেখা না ক'রে কিছুতেই যেতে চাচ্ছেন না। নাম তাঁরা একটা বলেছিলেন বটে, কিন্তু সেটা ঠিকভাবে উচ্চারণ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। মাস্টার যেন তাকে সেইজন্যে ক্ষমা করেন।

বিনিয়ন্-এর মুখে তখনো সেই হাসি। হুকুম দিলেন, 'ভদ্রলোকদের ভিতরে নিয়ে এসো।'

ঘরে প্রবেশ করলো দু-জন ভারতীয় ছোকরা। বাঙালী নয়, হিন্দুস্থানী। একজনের বগলে একটা কাপড়ে বাঁধানো কার্ড-বোর্ডের পোর্টফোলিও। অন্যজন সেটাকে খপ ক'রে ছিনিয়ে নিয়ে সামনের একটা টেবিলের উপর রেখে বললে, 'আমরা শুনেছি, আপনি নাকি ব্রিটিশ মিউসিয়ম্-এর তরফ থেকে ভারতীয় ছবি কেনেন? আমরা ক'খানা মোগলাই ছবি আপনার কাছে বিক্রির জন্যে এনেছি।'

পোর্টফোলিওটা যার বগলে ছিলো সে-ছোকরা এবার বললে, 'ওগুলো আমাদের দেশ থেকে সোজা এ-দেশে আনা। মোটমাট ছ'খানা আছে। এক-একটার জন্যে দশ পাউণ্ড ক'রে দাম চাই কিন্তু। খুব ভালো জিনিস সার্। ঠিক এ-রকমটা আর কোথাও পাবেন না সার্, তা ব'লে দিচ্ছি।' —এই ব'লে ছবি ক'খানা পোর্টফোলিও থেকে বের ক'রে বিনিয়ন্-এর মুখের সামনে সাজিয়ে ধরলো।

বিনিয়ন্ ছবিগুলোর উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। মুখে শুধু সেই হাসি।

রকম দেখে ছোকরারা ভাবলে, বিনিয়ন্ বুঝি দর কষাকষির তালে আছেন। যে-জন গোড়ায় কথা শুরু করেছিলো সে বললে, 'আচ্ছা, দশ পাউণ্ড যদি না-ও দেন, ন' পাউণ্ড ক'রে তো দেবেন?'

বিনিয়ন্ তখনো কথা বলেন না।

দ্বিতীয় ছোকরা ব'লে উঠলো, 'আচ্ছা, সাত পাউণ্ড? না? পাঁচ পাউণ্ড? তা-ও না? আচ্ছা, শেষ কথা— তিন পাউণ্ড ক'রেই দেবেন। আর কমাতে পারবো না কিন্তু সার্।'

বিনিয়ন্ তবুও চুপ। কিছুই বললেন না। তাঁর চোখ ছুটো তখন প্রায় বুঁজে এসেছে। মুখের হাসি যেন আরো কিছুটা পরিস্ফুট।

ছবিগুলো পোর্টফোলিওতে আবার ভরতে-ভরতে ছোকরাদের একজন কটু স্বরে ব'লে বসলো, 'আপনাদের ব্রিটিশ মিউসিয়ম্ ফ্রিটিশ মিউসিয়ম্ সবই দেখছি ভুয়ো ব্যাপার।'

বিনিয়ন্ তবুও নীরব। কোনোই প্রতিবাদ করলেন না। কেবল একটু এগিয়ে গিয়ে ঘণ্টার বড়িতে একটা টিপ দিলেন।

সঙ্গে-সঙ্গেই দাসী এসে হাজির। বিনিয়ন্ তাকে ধীরে-ধীরে বললেন, 'ভদ্রলোকদের বাইরে যাবার রাস্তাটা দেখিয়ে দাও।'

লাঞ্চের ঘণ্টা পড়লো। খাবার তৈরি। খাবার টেবিলে ব'সে বিনিয়ন্-এর মুখ খুললো। খেতে-খেতে বললেন, 'আশ্চর্য ভালো কপি!'

আমি বললুম, 'কপি?'

বিনিয়ন্ বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু সত্যি খুব ভালো কপি।'

তারপর আস্তে-আস্তে বিনিয়ন্ ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে লাগলেন— হালের কাগজ, নতুন রং, তুলির অত্যন্ত সাবধানী টান। এগুলোর থেকে কি ক'রে কপি ব'লে ধরা যায়, শেষে তার লক্ষণগুলোও একে-একে ব'লে গেলেন। আমি হতভম্ব হ'য়ে শুনে যেতে লাগলুম।

বিনিয়ন্ বললেন, 'কপি-করা ছবিকে পুরনো ছবি ব'লে চালানোর এক রীতিমতো বড়ো ব্যবসা আছে। সে কি ইয়োরোপে, আর কি

এশিয়ায়, সর্বত্র। যাঁরা চিনতে পারেন না, তাঁরা লোকসান দিয়ে শেষে হাত কামড়িয়ে মরেন।

তার পর দিন সকালবেলা।

একটা কি রেফারেন্স খোঁজবার দরকার পড়ায় ব্রিটিশ মিউসিয়ম্-এ যেতে হয়েছিলো। ফেরবার পথেই পড়ে গ্রেট্ রাস্‌ল্ স্ট্রীট। সেখানে এক সেকেণ্ডহ্যাণ্ড বই-এর দোকান। দোকানের মালিক লেভি ব'লে এক জাত-জু। লেভির ব্যবসাবুদ্ধি বেশ টনটনে। চারদিকে তার চার চোখ। তাই অনেক ভালো-ভালো বইপত্তর ছবি-ছাঁটা লেভি নানা জায়গা থেকে অল্প দামে সংগ্রহ করতে পারতো। অন্যের সঙ্গে কি করতো জানি নে, কিন্তু আমার উপর দিয়ে একহাত বাণিজ্য ক'রে নেবার ফন্দি লেভির কখনো দেখি নি। ভালো কিছু দোকানে এলেই আমাকে খবর দিতো। কিনতে চাইলে ন্যায্য মূল্যেই ছাড়তো।

আমাকে আসতে দেখেই লেভি বললো, 'গুড মর্নিং সার্! আজকে কতকগুলো ছবি আসতে পারে। একটু দাঁড়িয়ে যান, এখুনি হয়তো দেখতে পাবেন।'

আমি দোকানের ভেতর ঢুকে বই নিয়ে নাড়াচাড়া করছি, এমন সময় বাইরে মানুষের গলার আওয়াজ পেয়ে উঁকি মেরে দেখি, কাল বিনিয়ন্-এর কাছে যে দুই ছোকরা গিয়েছিলো, তারাই আজ লেভির দোকানে উপস্থিত। পাছে তারা আমায় দেখতে পেয়ে চিনে ফেলে, সেই মনে ক'রে আমি বই-এর গাদার আড়ালে গা-ঢাকা দিলুম।

তাদের দেখে লেভি জিগ্যেস করলো, 'কি হ'লো সার্?'

ছোকরাদের একজন বললো, 'কিছুই হ'লো না, তাই তোমার কাছে আবার ফিরে এলুম।'

তারপর দরদস্তুর চলতে লাগলো। শুনলুম এক ছোকরা বলছে, ‘আচ্ছা, পাঁচ শিলিং ক’রে দাও।’

আড়চোখে নজর মেরে দেখলুম, লেভি দু-হাত মাথার উপর উঠিয়ে চোখ দুটো কপালে তুলে বললে, ‘পাঁচ শিলিং! বলেন কি সার্? তার চেয়ে বরং আমার গলায় ছুরি দিন।’ —ব’লে হাতখানা নিয়ে গলায় ছুরি চালাবার ভঙ্গি করলে।

শেষে অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর দু-শিলিং ক’রে ছবিগুলোর দাম স্থির হ’লো। লেভি ওয়েস্টকোটের পকেট থেকে একটা ময়লা দশ শিলিং-এর নোট আর দুটো রুপোর শিলিং বের ক’রে ছোকরার হাতে দিলো। তারপর পোর্টফোলিওটা খুলে দেখে নিলে, ছ’খানা ছবি তাতে ঠিক আছে কিনা।

ছোঁড়ারা চ’লে যেতে লেভি ছবিগুলো আমার সামনে ধ’রে বললে, ‘দেখুন দিকি সার্, কেমন জিনিস।’

আমি বললুম, ‘ওগুলো আগেই দেখেছি।’

লেভি আকাশ থেকে পড়লো। থতোমতো খেয়ে এক নিশ্বাসে শুধোলো, ‘কোথায়? কখন সার্?’

আমি উত্তর দিলুম, ‘কাল বিকেলে, লরেন্স বিনিয়ন্-এর বাড়িতে।’

লেভি একচোট খুব হেসে নিলো। একগাল হাসিমুখে বললো, ‘তাই নাকি? আপনি সেখানে ছিলেন? আরে, আমিই তো ওই দুই ইয়ং জেণ্টল্‌মেনকে মিস্টার বিনিয়ন্-এর কাছে পাঠিয়েছিলুম।’

এবার আমার অবাক হবার পালা। প্রশ্ন করলুম, ‘তুমি? কেন বলো তো হে?’

তখন লেভি সব কথা খুলে বললে। ছোকরারা ছবিগুলো নিয়ে তারই কাছে প্রথম আসে। ছবি সম্বন্ধে একটু সন্দেহ হওয়ায়, সে-ই ওই

ছু-জনকে লরেন্স বিনিয়ন্-এর কাছে পাঠায়। ব'লে দেয়, সবচেয়ে বেশি দাম ওইখানেই পাবে। আদত কথা লেভির মনে ছিলো, বিনিয়ন্ যদি ছবিগুলো কেনেন তা হ'লে ঠিক বোঝা যাবে, ছবিগুলো আসল কিনা। আর যদি তিনি না নেন তো তখুনি ধরা প'ড়ে যাবে, ছবিগুলো নকল। আসল হ'লে বিনিয়ন্সাহেব কখনই সেগুলো হাতছাড়া করবেন না, নেবেন-ই নেবেন, এ-কথা লেভি জানে। কথা ছিলো, বিনিয়ন্-এর কাছে বিক্রি করতে পারলে ছোকরারা লেভিকে দামের দশ পারসেণ্ট কমিশন দেবে। বিক্রির পথ বাতলিয়ে দেবার জন্যেই এই কমিশন।

এতোক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হ'লো। আর-একটু খোলসা ক'রে নিতে গিয়ে আমি সসংকোচেই জিগ্যেস করলুম, 'যদি ওরা ছবি বিক্রি ক'রে কমিশনটা তোমায় না দিয়েই পালাতো ?'

লেভি বললে, 'ব্যবসা করতে গেলে ও-রকম একটু-আধটু বিশ্বাস করতেই হয়। তাতে একেবারে যে কখনো ঠকি নি, তা নয়। তবে খুবই কম।'

ছবিগুলো লেভির হাত থেকে নিয়ে বই-এর স্তূপের উপর বিছিয়ে আমি সেগুলোকে ভালো ক'রে দেখতে লাগলুম। বিনিয়ন্ ঠিকই বলেছিলেন। ছবিগুলো আশ্চর্য রকমের ভালো কপি।

লেভিকে জিগ্যেস করলুম, 'এগুলো কতোতে ছাড়বে ?'

লেভি বললে, 'আপনি নেবেন সার্ ? সব জেনে-শুনে ?'

আমি 'হ্যাঁ' বলায় লেভি জানালে, 'আপনি তো দেখলেনই সার্, আমি ওগুলো কততে কিনলুম।' তারপর খানিক মাথা চুলকে বললে, 'তা আপনি তিন শিলিং ক'রেই দেবেন সার্।'

আর কথাটি না ব'লে আমি পকেটবুক থেকে একটা করকরে পাউণ্ড-নোট বের ক'রে দিলুম। লেভি বারকতক থ্যাংক ইউ সার্, থ্যাংক ইউ

সার্ বলতে-বলতে ছ-শিলিং চেঞ্জ ফেরত দিলো। তারপর পোর্টফোলিওটা ব্রাউন পেপারে মুড়ে একটা বাণ্ডিল ক'রে ফেললে। আমি সেটাকে বগলদাবা ক'রে লেভির দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

পরে ছবিগুলো বেশ দাঁও-এ ঝেড়ে দেবার সুযোগ ঘটেছিলো। অনেকেই কপি ব'লে ধরতে পারেন নি। কিন্তু বেচি নি। বেচতে কেমন মন সরলো না। ছবিগুলো এখনো আমার কাছে আছে। মাঝে-মাঝে বের ক'রে দেখি।

তবে বিনিয়ন্-এর সঙ্গে সেই সেবার কথা হবার পর আমার ছবি কেনার বাতিক অনেক ক'মে গেছে।

এখন অনেক বুঝে-সুঝে ও-বাতিকের চর্চা করি।

শেল্‌ শক্‌

সেদিন হাতে কোনো কাজ ছিলো না, তাই ব'সে-ব'সে এক পুরনো অ্যালবামের পাতা ওল্টাচ্ছিলুম। সবই প্রায় বিদিশি বন্ধুদের ছবি। দিশি লোকরা নিজেদের ছবি তোলান খুবই কম। আর কচিৎ তোলালেও বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে বিতরণ করেন ততোধিক কম।

আশ্চর্য! প্রথম ছবিটাই কি ক্যাপ্‌টেন রবার্ট-এর। পদবীটা বললুম না। ক্যাপ্‌টেন-এর মৃত্যু কেমন যেন একটু রহস্যময়। ডাক্তাররা অবশ্য বলেছিলেন, নার্ভাস এগ্‌জস্‌শন। ক্যাপ্‌টেন যুদ্ধক্ষেত্রে যে শেল শক খেয়েছিলেন, তারই শেষ অবস্থা। কিন্তু আমি ক্যাপ্‌টেন-এর মৃত্যুর ঠিক তিনদিন পূর্বে হাসপাতালে তাঁর সঙ্গে খানিকটে সময় কাটিয়েছিলুম। সে-সময় তিনি যে-সব কথা আমায় বলেছিলেন, ডাক্তাররা তা শুনলে অসুখটার কি নাম দিতেন, বলা শক্ত।

সেই জন্যে ক্যাপ্‌টেন-এর আসল পদবীর বদলে তাঁকে ক্যাপ্‌টেন গ্রীন ব'লে বর্ণনা করছি। গ্রীন অতি সাধারণ ইংরিজি পদবী। তার থেকে কেউ কিছু ধরতে-ছুঁতে পারবেন না। কি জানি, আমার এই লেখাটা কখন কার চোখে পড়ে, তার কিছু ঠিক নেই। ক্যাপ্‌টেন-এর এক-সময় বেশ নাম-ডাক ছিলো। আদত নাম বললে অনেকেই তাঁকে চিনে ফেলবেন। সেটা ঠিক কাজ হবে না।

ক্যাপ্‌টেন গ্রীন পাক্কা লণ্ডন ককনি। লণ্ডনের পথেঘাটেই মানুষ। এককালে লণ্ডনের রাস্তায়-রাস্তায় খবরের কাগজ ফিরি ক'রে বেড়াতেন। তবে সে অনেক দিন আগেকার কথা। তারপর তিনি টট্‌নহাম কোর্ট

রোডে একটা ছোটো স্টেশনরি দোকান দেন। দোকানের ঠিক মাথার উপরেই একটা ঘরে বসবাস করতেন। হাতে কিছু জমতেই বিয়ে ক'রে বসলেন। তখন পাশের আর-একটা ঘর নিয়ে তাতেই সংসার পাতলেন।

রবার্ট গ্রীন-এর পড়াশুনোর বাতিক ছিলো। মিউডি আর টাইমস-এর লেনডিং লাইব্রেরি থেকে হরেক রকমের বই আনিয়ে অবসর সময়ে ব'সে-ব'সে পড়তেন। এই নিয়ে মিসেস গ্রীন-এর সঙ্গে তাঁর একটু খিচখিচ চলতো। ভর্ সন্ধ্যেবেলায় থিয়েটার বায়স্কোপ নাচগানের আড্ডা পার্টি এ-সব ছেড়ে, বই মুখে নিয়ে ঘরে প'ড়ে থাকলে কোন্ স্ত্রী-ই বা মন-মেজাজ ঠিক রাখতে পারেন?

বেশ সব চলছিলো। এমন সময় প্রথম মহাযুদ্ধ বেধে গেলো। রবার্ট গ্রীন বইপত্তর ছুঁড়ে ফেলে, দোকানের ভার স্ত্রীর উপর চাপিয়ে প্রথম হিড়িকেই ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। এই যুদ্ধেই বেশ বোঝা গিয়েছিলো লণ্ডন-ককনিরা কী চিজ, তারা কোন্ ধাতুতে গড়া। ভয়ডর জানে না। কিছুতেই পেছপাও হয় না। স্বচ্ছন্দে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করে। অথচ, তাই নিয়ে একটুকুও গর্ব-বড়াই নেই। কেউ সে-সম্বন্ধে কোনো কথা উল্লেখ করতে গেলে লজ্জায় লাল হ'য়ে ওঠে।

গ্রীন যুদ্ধে অসম্ভব বীরত্ব দেখিয়ে ভি-সি পেয়ে গেলেন। ভিক্টোরিয়া ক্রশ-এর গৌরব পেলেন বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যটি তাঁর একেবারে ভেঙে পড়লো। বাইরে থেকে কিছু বোঝবার জো নেই, কিন্তু ভিতরে কি যেন একটা গলদ র'য়ে গেলো। মাঝে-মাঝে সেটা বিচিত্রভাবে আত্মপ্রকাশ করতো। ডাক্তাররা বলতেন, শেল শক-এর আফ্টার এফেক্ট।

ধীরে-ধীরে গ্রীন ক্যাপ্টেন হলেন। শরীর জখম হ'লেও লড়াই ছাড়লেন না। শেষপর্যন্তই যুদ্ধক্ষেত্রে র'য়ে গেলেন। ১৯১৮ সালের শেষের দিকে যুদ্ধ খতম হ'লো। ১৯১৯-এর গোড়ায় ক্যাপ্টেন গ্রীন বাড়ি ফিরে

এলেন। ইংরেজরা বড়ো মজার জাত। তাদের কাছে সৈনিকপুরুষদের আদর ততোক্ষণই, যতোক্ষণ-না লড়াই থামছে। তারপর তুমি কার, কে তোমার। এর কারণ বোধ হয় ইংরেজরা আদবেই মিলিটারি মেজাজের লোক নয়। কাজ-কারবার ভালো ক'রে চালিয়ে দু-পয়সা আমদানি করতে পারলেই তারা খুশি। নেহাত দায়ে প'ড়ে তাদের যুদ্ধ করা।

ভাগ্যিস গ্রীন-এর স্টেশনরি দোকানটা তখনো ছিলো। নইলে, শুধু আর্মি পেনসন-এর উপর নির্ভর ক'রে থাকতে হ'লে তাঁর দিন চলা ভার হ'তো। এদিকে গ্রীন-এর মনে-মনে পলিটিক্সে নামবার ভারী ইচ্ছে। পারলামেণ্টে ঢোকবার জন্যে তৈরি হ'তে লাগলেন। গ্রীন বেশ বক্তৃতা দিতে পারতেন। চেষ্টা-চরিত্র ক'রে বক্তৃতা দেওয়ার কৌশলটা আয়ত্ত ক'রে নিয়েছিলেন। স্থানে-অস্থানে যখন-তখন বক্তৃতা দিতে-দিতে ও-বিষয়ে ধীরে-ধীরে বেশ পোক্ত হ'য়ে উঠছিলেন। শেষে, নাকি মনে নেই, কোন-এক ছোটো কনস্টিট্যুয়েন্সি থেকে পারলামেণ্টে রিটার্নডও হ'য়ে গেলেন।

ক্যাপ্‌টেন গ্রীন-এর সঙ্গে আমার খুব আলাপ জ'মে গিয়েছিলো। আমি মাঝে-মাঝে তাঁকে তাতাতুম। আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা ও-দেশে গিয়ে কাজ শেখবার জন্যে কেন সহজে বিলিতি ফ্যাক্টরিতে ঢুকতে পায় না— আমার এই অভিযোগ নিয়ে ক্যাপ্‌টেন গ্রীন একবার পারলামেণ্টে তুমুল বচসা লাগিয়ে দিলেন। তাতে আশাতীত কিছু লাভ না হ'লেও খানিকটা ফল যে ফলেছিলো, তা মানতেই হবে।

একটু প্রতিষ্ঠা হ'তেই, আর তার সঙ্গে খানিকটা অর্থাগম ঘটতে ক্যাপ্‌টেন গ্রীন তাঁর টটনহাম কোর্টের বাসাটা তুলে দিলেন। স্টেশনরির দোকানও উঠিয়ে দিলেন। দিয়ে, ট্যুইক্‌নহামে এক বাড়ি নিলেন। ট্যুইক্‌নহামকে লণ্ডনের শহরতলি বলা চলে। বাড়িটা এক জমিদারের।

সে-জমিদার এক-আধ পুরুষ নন, চোদ্দ পুরুষ ধ'রে ব্যারনেট। মহাযুদ্ধের ফলে, অনেক পুরনো বনেদী জমিদার-ঘরের দুর্গতির একশেষ। ট্যাক্স্ দিতে-দিতে প্রাণান্ত। অনেক জমিদারই ঘরবাড়ি বাগান-বাগিচা আসবাবপত্তর বেচে-বুচে কিছু টাকা সংগ্রহ ক'রে, পয়সা রোজগারের চেষ্টায় এদিক-ওদিক বেরিয়ে পড়লেন।

যুদ্ধকালে আমাদের ব্যারনেট ক্যাপ্টেন গ্রীন-এর সঙ্গে একই রেজিমেণ্টে ছিলেন। দু-জনের মধ্যে প্রণয়ও ঘটেছিলো। ক্যাপ্টেন গ্রীন এক লড়াই-এ ব্যারনেটকে গোলার মুখ থেকে টেনে বের করেছিলেন। একটু সস্তাদরেই ব্যারনেট তাঁর ট্যুইক্‌নহামের বাড়িটা ক্যাপ্টেন গ্রীনকে পাঁচ বছরের মেয়াদে ইজারা দিয়ে দিলেন। সস্তাই বলতে হয়। কারণ, ব্যারনেট তাঁর বন্ধুর কাছ থেকে সেলামি আদায় করলেন না। আর, গাই-এর সঙ্গে যেমন একটা বাছুর ফাউ পাওয়া যায় ক্যাপ্টেন গ্রীন তেমনি বাড়ির সঙ্গে পাঁচ বছরের জন্যে জমিদারবাড়ির গ্লাস প্লেট লিনেন ফারনিচর লাইব্রেরি— সবই ব্যবহারের অধিকার পেয়ে গেলেন।

ট্যুইক্‌নহামের বাড়িটা নেবার কিছুদিন পরেই ক্যাপ্টেন গ্রীন আমাকে নেমন্তন্ন ক'রে পাঠালেন, আমি যেন তাঁর নতুন বাড়িতে গিয়ে দিন পনেরো তাঁর সঙ্গে কাটিয়ে আসি। লিখেছেন, 'তুমি এলে আমরা সবাই খুব খুশি হবো। পুনশ্চ— ড্রেস্-স্যুট আনবার দরকার নেই।'

ড্রেস্-স্যুটের বালাই না থাকলে বিলেতে পাঁচ-দশ দিন লোকের বাড়ি বেড়িয়ে আসতে কোনোই হ্যাঙ্গাম নেই। গোটা-ছয়েক শার্ট কলার আর রুমাল, দু-চার জোড়া মোজা, দু-তিনটে টাই-বো, এক-স্যুট পায়জামা আর এক-স্যুট ভালো-গোছের কোট-প্যাণ্ট, একটা টুথব্রাশ, এক-টিউব টুথপেস্ট, চুল আঁচড়াবার চিরুনি-বুরুশ, দাড়ি কামাবার সরঞ্জাম, একজোড়া স্লিপার কোনোরকমে ব্যাগে পুরে যাত্রা করলেই হ'লো।

আমার হাতে তখন এমন-কিছু কাজ ছিলো না যার জন্যে লণ্ডনে ব'সে থাকতে হয়। আর, টুাইক্‌নহাম কি-ই বা দূর। ট্রেনে বাসে এই আধ-ঘণ্টা কি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মামলা। স্যুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে সন্ধ্যের মুখে ক্যাপ্‌টেন গ্রীন-এর বাড়ি হাজির হলুম। তখন বসন্তকাল কেটে গিয়ে গ্রীষ্মকাল পড়ো-পড়ো। আকাশ পরিষ্কার। গাছপালাগুলোর গায়ের ধুলোবালি ধুয়ে-মুছে যাওয়ায় উজ্জ্বল তাদের শ্যামশ্রী। বড্ডো ভালো লাগছিলো।

ওখানকার বাড়িগুলো সব ভিলা-প্যাটার্নের। একটার সঙ্গে আর-একটা লাগাও হ'য়ে গা-ঘেঁষাঘেঁষি ক'রে দাঁড়িয়ে নেই। সব বাড়িরই চারধারে বেশ-একটু কমপাউণ্ড আছে। বাড়িগুলো কিন্তু সেই মান্ধাতার আমলের। কোনোটা কাঠের, কোনোটা পাথরের, কোনোটা আবার লাল পোড়া-ইটের। শহরের মতো সব বাড়ি এক ধরনের এক মাপের নয়। কোনোটা খুব উঁচু। কোনোটা বেশ নিচু। কোনোটা আবার মাথায় মাঝারি সাইজের।

বাইরের গেটটা আল্‌গা ভেজানো ছিলো। সেটা দিয়ে ঢুকে, কাঁকর বিছানো রাস্তা বেয়ে তিনধাপ পাথরের সিঁড়ি উঠে সদর-দরজা। ঘণ্টা টিপতেই দরজা খুলে গেলো। সামনেই প্রকাণ্ড হল্। ক্যাপ্‌টেন গ্রীন, মিসেস গ্রীন আর তাঁদের মেয়ে এথেল সেখানে দাঁড়িয়ে। তাঁদের মুখ দেখে মনে হ'লো, আমায় আসতে দেখে তাঁরা সত্যিই খুশি। আমি একে-একে তিন জনের সঙ্গে শেকহাণ্ড করলুম।

ক্যাপ্‌টেন-এর চেহারাটা কিন্তু বড়ো শুকনো-শুকনো ব'লে মনে হ'লো। মিসেস্ গ্রীন সেই আগের মতোই মোটাসোটা গোলগাল। মুখচোখ হাসিখুশিতে ভরা। মুখে সর্বদা খই ফুটছে। এথেল বেশ বড়ো হ'য়ে উঠেছে। ভদ্রমহিলা হ'তে চললো। নামজাদা এক মেয়ে-ইস্কুলে

পড়ে। গরমের ছুটিতে বাড়ি এসেছে। ইস্কুলে ফ্রেঞ্চ শিখছে, পিয়ানো বাজাচ্ছে, দু-একটা ওয়াটার-কলর ছবিও আঁকছে। আজকাল সে খুব ধীরে-ধীরে কথা বলে, পাছে পূর্ব-সংস্কারবশত ককনি ভাষা মুখ দিয়ে কোন্ ফাঁকে অজান্তে বেরিয়ে পড়ে। তার মা হ্যাটকে অ্যাট, কি হেয়ারকে এয়ার ব'লে ফেললে ভুরু কুঁচকে মা-র মুখের দিকে সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে।

হল্-এর ঠিক মাঝখান দিয়ে একজোড়া কাঠের সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। সিঁড়ির কী কারুকার্য! দু-দণ্ড দাঁড়িয়ে গিয়ে তারিফ করতে হয়। হল্-এ আলো জ্বলছে, তবুও যেন কিরকম অন্ধকার-অন্ধকার। ভালো ক'রে চেয়ে দেখি, সমস্ত দেওয়ালগুলো আর মাথার উপরের সিলিং কাঠের প্যানেল করা। সে-কাঠের রং এক-সময় কি ছিলো, বলা যায় না। কিন্তু এখন একেবারে কুচকুচে কালো। তার উপর দেওয়ালের যেখানে যেটুকু ফাঁক-ফোঁক আছে সমস্তই কালো-কালো পুরনো ঢাল-তলোয়ারে সাজানো। অন্ধকার হবেই তো।

ক্যাপ্টেন গ্রীন বললেন, 'চলো চ্যাটার্জি, তোমার শোবার ঘর দেখিয়ে আনি।' স্যুটকেশটা মাটিতে নামিয়ে রেখেছিলুম, উঠিয়ে নিলুম। ক্যাপ্টেন-এর পিছু-পিছু সিঁড়ি বেয়ে চললুম। যখন প্রায় দেড়-তলার ল্যানডিং-এর কাছ-বরাবর পৌঁছেচি তখন দেখি, সামনের দেওয়ালে সাত ফুট লম্বা এক ছবি টাঙানো। গিল্টির ফ্রেমে বাঁধানো এক বিরাট মানুষের মূর্তি। তিনি কোন্ যুগের মানুষ, বুঝতে পারলুম না। ইংরিজি পোশাকতত্ত্বে আমার এমন অধিকার নেই যে, দেখেই ব'লে দিতে পারি, তিনি কুইন এলিজাবেথের আমলের, কি কুইন অ্যান-এর আমলের। তবে কুইন ভিক্টোরিয়ার আমলের যে লোক নন, তা বুঝতে পারলুম। নিশ্চয় ক্যাপ্টেন গ্রীন-এর বন্ধু ব্যারনেটেরই কোনো পূর্বপিতামহ হবেন।

হঠাৎ মানুষটার চোখের উপর আমার চোখ পড়ায় ভয়ে আমার সমস্ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। স্যুটকেশটা অসাড়ে হাত থেকে খ'সে প'ড়ে গেলো। স্পষ্ট মনে হ'লো, লোকটার যেন আমার উপর বিষম রাগ। সে যেন বলতে চায়, তুই বেটা কে রে? ওই ব্যাগের মতো গ্রে ফ্ল্যানেলের ট্রাউজার্স আর ওই অদ্ভুত ছিটের টুইড কোট প'রে কি সাহসে তুই এই জমিদারবাড়ি ঢুকেছিস? কোনো কি কাণ্ডজ্ঞান নেই? একটু সমীহ নেই? একেবারে অনধিকার প্রবেশ?

আমি ঘামতে লাগলুম।

ক্যাপ্‌টেন গ্রীন আমার স্যুটকেশটা তুলে নিলেন। আমার অবস্থা দেখে বললেন, 'আমারও মাঝে-মাঝে ওইরকম হয়।' কথাটার অর্থ ঠিক বুঝলুম না। ক্যাপ্‌টেন-এর এক হাতে আমার স্যুটকেশ, আর-এক হাত খালি। খালি হাতটা দিয়ে আমায় জড়িয়ে বগলদাবা ক'রে বললেন, 'ভয় নেই, চলো।' আমি চোখ বুঁজে জায়গাটা পার হলুম। এমনি আমার ভয়।

উপরে উঠে আমার ঘর দেখে সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেললুম। একেবারে হালফ্যাশনের সাজসজ্জা। ফিকে নীল রঙের ওঅলপেপারে দেওয়াল মোড়া। ঘোর নীল রঙের পুরু কার্পেট কাঠের মেজেয় পাতা। খাট-বিছানা চেস্ট-অভ্‌-ড্রয়ার্স টেবিল-চেয়ার ড্রেসিং টেবিল চামড়ার আর্মচেয়ার— সবই এ-কালের জানা জিনিস। কেবল ফায়ারপ্লেস আর তার উপরের ম্যান্‌টলপিসটা বাড়িরই মতো পুরনো। তা হোক, কিন্তু ভারী সুন্দর জিনিস। তবে ওদের সঙ্গে এ-কালের নতুন ঝকঝকে পেতলের হাতা-চিমটে পোকার একেবারেই মানাচ্ছে না যেন। ক্যাপ্‌টেন গ্রীন বুঝিয়ে দিলেন, বাড়ির এ-দিকটা হালে তৈরি।

ক্যাপ্‌টেন গ্রীন আমার স্যুটকেশটা টেবিলের উপর নামিয়ে দিলেন। তারপর কোথা থেকে চট্‌ ক'রে আনকোরা নতুন এক শিশি স্মেলিং-সল্ট

এনে হাজির করলেন। তিনি কি ক'রে বুঝলেন জানি নে, আমার মাথাটা বড্ডো ধ'রে উঠেছে।

গ্রীন চ'লে যেতে আমি স্যুটকেশ থেকে কাপড়চোপড় বের ক'রে চেস্ট-অভ্-ড্রয়ার্সে সাজিয়ে রাখলুম। পায়জামা স্যুট বের ক'রে খাটের উপর বালিশের নিচে গুঁজে দিলুম। টুকিটাকি জিনিসগুলো ড্রেসিং টেবিলের উপর সাজালুম। তারপর বিছানার উপর লম্বা হ'য়ে শুয়ে প'ড়ে ভাবতে লাগলুম, আমি তো আইন-পড়িয়ে মাথা-ঠাণ্ডা লোক। একটা ছবি দেখে আমার কেন এমনধারা হ'লো? এখনো একলা থাকতে গা ছমছম করছে। ভেবে কূলকিনারা পেলুম না।

গং বেজে উঠলো। কাপড় ছাড়তে যাবার ঘণ্টা। স্নানের ঘর পাশেই। সেখানে গিয়ে প্রথম মাথাটা বেশ ক'রে ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেললুম। বড়ো আরাম হ'লো। তারপর ড্রয়ার থেকে ডার্ক নেভি-ব্লু স্যুটটা বের ক'রে পরলুম। জুতো জোড়াটার ধুলো ঝেড়ে ভেল্ভেটের প্যাড্টা তার উপর বার কয়েক বুলিয়ে নিলুম। আবার গং বাজলো। এটা ডিনার বেল্, অর্থাৎ আহার প্রস্তুত। ঘরের দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখি, করিডরে ক্যাপ্টেন গ্রীন নিজে দাঁড়িয়ে। বুঝলুম, আবার তো সেই ছবি পেরুতে হবে। তিনি আমার সঙ্গে থাকতে চান, যাতে কোনো অঘটন না ঘটে।

মিসেস গ্রীন আর এথেলও তাঁদের ঘর থেকে বেরুলেন। তাঁদের আগে যেতে আমরা পথ ছেড়ে দিলুম। দেখলুম, তাঁরা দিব্যি সহজেই ছবিটা পার হ'য়ে গেলেন। একটুও কোনোরকম চাঞ্চল্য নেই। আমারই-বা এতো ভয় কেন? ভাবলুম, চেষ্টা ক'রে দেখি, আমিও এই ছেলেমানুষী ভয় তাড়াতে পারি কিনা। কিন্তু ছবির কাছে আসবার আগেই ক্যাপ্টেন গ্রীন আমার হাত ধরলেন। আপনা হ'তেই চোখ বুঁজে

এলো। গা সিরসির ক'রে উঠলো। চোখ খুলতে দেখি, একতলায় পৌঁছে গেছি।

একতলাতেই ডাইনিং রুম। এরকম অদ্ভুত ডাইনিং রুম আমি আগে কখনো দেখি নি, পরেও কখনো না। যেমন লম্বা তেমনি চওড়া এক প্রকাণ্ড হল্‌ঘর। তার এক দিকটায় আলো আর-এক দিক আবছা অন্ধকার। যে-দিকটায় অন্ধকার, সেদিকে এক মস্ত বড়ো ডাইনিং টেবিল শূন্য প'ড়ে আছে। তার চারধারে অন্তত পক্ষে এক শো চেয়ার হবে। পুরু চামড়ার গদি-আঁটা চেয়ার। চেয়ারের পিঠে ব্যারনেটদের কোট্-অভ্-আরম্‌স সোনার জলে নক্সাকাটা। যেদিকে আলো, সেদিকে একটা ছোটো গোল টেবিলে আমাদের চারজনের খাবার জায়গা করা। গেলাশ পেলেট ছুরি কাঁটা চামচ সাজানো।

গোল টেবিলের মাথায় বসলেন ক্যাপ্‌টেন গ্রীন। তাঁর উল্টোদিকে মুখোমুখি মিসেস গ্রীন। তাঁদের এক পাশে এথেল আর-এক পাশে আমি। মিসেস গ্রীন অনর্গল ব'কে চলেছেন। এথেল মাঝে-মাঝে দু-একটা, আর আমি কেবল হুঁ-হাঁ ক'রে কথা কাটিয়ে দিচ্ছি। ক্যাপ্‌টেন গ্রীন একেবারে চুপ। একমনে খেয়ে চলেছেন। কিন্তু কিছুই যেন কিছু জমতে চাচ্ছে না। সবেতেই কেমন যেন একটা খাপছাড়া-খাপছাড়া ভাব। কি-যেন একটা অনির্দিষ্ট বাধা সব তাতেই এসে পড়ছে।

কোনোরকমে খাওয়া শেষ হ'লো। বিলিতি কেতা-অনুসারে মিসেস গ্রীন আর এথেল আমাদের ছেড়ে ড্রয়িং রুমে চ'লে গেলেন। এই সময়টা পুরুষদের মদ খাবার সময়। মুখ আলগা ক'রে খানিকক্ষণ খিস্তির ইয়ারকিও ওই সময় দেওয়া চলে। আমি মদ খাই নে। দু-একটা বাদাম আখরোট ক্র্যাকারে ভেঙে মুখে পুরছিলুম। ক্যাপ্‌টেন গ্রীন ব্যারনেটদের মনোগ্রাম খোদাই করা কাট্-গ্লাশের তৈরি সরু ফিনফিনে নীল রঙের

ভিনিশিয়ন গেলাশে পোর্ট ঢাললেন। কিন্তু যেই মুখে তুলবেন, ওমনি অমন সুন্দর গেলাশটা তাঁর হাত ফস্‌কে মাটিতে প'ড়ে ভেঙে চুরমার। তাকিয়ে দেখি, ক্যাপ্‌টেন গ্রীন ডাইনিং রুমের অন্ধকার দিকটায় একদৃষ্টে চেয়ে আছেন।

ক্যাপ্‌টেন-এর দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে আমিও ওই অন্ধকার দিকটায় তাকালুম। প্রথম দু-এক মিনিট কিছুই দেখতে পাই নে। তারপর তাকাতে-তাকাতে অন্ধকারটা যখন চোখ-সহা হ'য়ে এলো তখন দেখি, সেখানের দেওয়ালেও একটা প্রকাণ্ড ছবি ঝোলানো। সিঁড়ির ল্যাণ্ডিং-এর দেওয়ালের মতো অতো বড়ো না হ'লেও বেশ প্রমাণসই। ইনিও বোধ হয় ব্যারনেটের পূর্বপুরুষদের আর-একজন হবেন। অন্ধকারে তাঁর চেহারাটা ঠিক ধরা যাচ্ছে না, কিন্তু তাঁর চোখ দুটো যেন আগুন হান্‌ছে। আগুনের ফিন্‌কি ছিটিয়ে চোখ দুটো যেন বলতে চায়, আস্পর্ধা তো কম নয়? আমার সাধের ভিনিশিয়ন গেলাশে তোর ওই পচা মদ ঢেলে খাওয়া হচ্ছে? অসভ্য বেল্লিক বে-আক্কেল কোথাকার!

কাঁচ-ভাঙার শব্দে মিসেস গ্রীন ড্রয়িং রুম থেকে দৌড়ে এলেন। একবার আড়চোখে ক্যাপ্‌টেন গ্রীন-এর দিকে চাইলেন। তারপর আমার কানে-কানে ফিসফিস ক'রে বললেন, 'কিছু মনে কোরো না মিস্টার চ্যাটার্জি। শ্শেল শক-এর ফল। এখানে আসা অবধি ক্যাপ্‌টেন-এর ওইরকম একটা-না-একটা কিছু হচ্ছে। ডাক্তার দেখাতে বলছি, উনি কিছুতেই শুনবেন না।'

শ্শেল শক? হবেও-বা।

ক্যাপ্‌টেন গ্রীন তখনো সেই অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। মিসেস গ্রীন তাড়াতাড়ি একটা কাঁচের কুঁজো থেকে, তারই মাথায় ঢাকা-দেওয়া শাদামাটা একটা গেলাশে একটু জল গড়িয়ে

ক্যাপ্‌টেনের মুখের কাছে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'খাও।' ক্যাপ্‌টেন কলের পুতুলের মতো সেটা একঢোঁকে গিলে ফেললেন। জল খেয়ে ক্যাপ্‌টেন একটু সুস্থ বোধ করতে লাগলেন। তাঁর মুখে আবার রক্তের আভা ফিরে এলো। লজ্জিত হ'য়ে তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

মিসেস গ্রীন-এর পিছন-পিছন আমরা ড্রয়িং রুমে এলুম। ক্যাপ্‌টেন-এর জন্যে একপাত্র কড়া কফি আনানো হ'লো। দুধ-চিনির বদলে তাতে দু-এক চামচ পুরনো ব্র্যাণ্ডি মিশিয়ে চুমুক দিতে-দিতে ক্যাপ্‌টেন সেটা শেষ করলেন। তাতে আরো-একটু তাজা হলেন।

এথেল আপন মনে তার পিয়ানো বাজিয়ে চলেছে। আমাদের দিকে তার দৃকপাত নেই। আমার মনে কেবলি এই কথা তোলপাড় করছে— ক্যাপ্‌টেন না-হয় যুদ্ধক্ষেত্রে শেল শক খেয়েছেন, কিন্তু আমার কি হ'লো। ম্যাপে-প্ল্যানে ছাড়া কোনো যুদ্ধক্ষেত্র তো চোখে দেখি নি। তবে আমার কেন এমনধারা অসোয়াস্তি?

হঠাৎ ধ্যানভঙ্গ হ'য়ে গেলো। সামনে তাকিয়ে দেখি, এথেলের বাজনা থেমে গেছে। এথেল আর তার মা দু-জনে মিলে একবার পিয়ানোর ডালা খুলে দেখছেন, আর-একবার তার পিছন থেকে ধাক্কা মারছেন, আবার একবার তার দু-পাশে টোকা মেরে কি যেন পরখ করছেন।

পিয়ানো বাজতে-বাজতে হঠাৎ যে সেই থেমে গেলো, আর বাজে না। ব্যাপার কি দেখবার জন্যে এগিয়ে গেলুম। ওরে বাবা! আবার যে একটা ব্যারনেট! সামনের দেওয়ালের ছবির থেকে মুখ বাড়িয়ে আছে। এথেল-এর উপরই তার যতো আক্রোশ। কিন্তু এথেল-এর মনে কোনো ভয়-ভাবনা নেই। কেবল আমারই কেমন মনে হ'তে লাগলো, ছবির ব্যারনেট এথেলের উদ্দেশে বলছে, তুই ছুঁড়ি তো আচ্ছা বেয়াদব! তুই আমাদের এই সাত পুরুষের ড্রয়িং রুমে মিউজিক-হল্‌-এর ঠুনকো

ঠুংরির গৎ বাজাতে একটুও দ্বিধা-সংকোচ করলি নে? বেয়াকুব কোথাকার!

ধীরে-ধীরে নিজের চেয়ারে এসে বসলুম। পাশেই ক্যাপ্‌টেন গ্রীন। তাঁর মুখ থেকে কেবল এক অস্ফুট আওয়াজ বেরুলো— হুঁ!

না, আর পারা যায় না। শুতে যাওয়াই ভালো। কিন্তু বেশ বুঝছি, আজ রাত্তিরে ঘুমের দফা রফা। একটা বই সঙ্গে রাখা বুদ্ধির কাজ হবে। ড্রয়িং রুমের পাশেই লাইব্রেরি। পা টিপে-টিপে সেখানে ঢুকলুম। বই ঘাঁটতে আমার সব সময়েই আনন্দ। তখন ছেলেবয়েসে ও-বিষয়ে আরো বেশি উৎসাহ ছিলো। বাপ রে বাপ! কী দেওয়াল-ঠাসা বই! ফ্লোর থেকে সিলিং পর্যন্ত শেল্‌ফ উঠে গেছে। একটিও কিন্তু এ-কালের বই নয়। একদিকে কেবল গ্রীক ল্যাটিন। আর-একদিকে ইংরিজি ক্ল্যাসিক্‌স। অন্য দু-দিকে পাঁচমিশেলি— ইতিহাস ভূগোল দর্শন ভ্রমণ-কাহিনী জীবন-চরিত যুদ্ধবিদ্যা ব্ল্যাক-আর্টস ম্যাজিক— কিছুই বাদ নেই। আর বাইবলই কতো রকমের। বড়ো মেঝো ছোটো। এ তোমার কাপড়ে রেক্সিনে কি বোর্ডে বাঁধানো ডাসট্‌-জ্যাকেট পরানো ফঙ্গবেনে সস্তাদরের কেতাব নয়। রীতিমতো ব্রাউন চামড়ায় মোড়া সোনার জলে নক্সা-কাটা সোনার জলে নাম লেখা ভারী-ভারী চৌকো-চৌকো টালির মতো বই।

ইংরেজদের একটা মহা সদ্‌গুণ, তাঁরা সদাসর্বদা অতিথির পিছনে লেগে থাকেন না। তাকে নিজের মনে থাকতে দেন। একা-একা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বই-এর নাম পড়তে-পড়তেই খানিক সময় কেটে গেলো। কিন্তু ঘুম তাড়াবার মতো একটা বইও চোখে পড়লো না। অর্থাৎ, সেল্‌ফে একটাও ডিটেকটিভ উপন্যাস দেখতে পেলুম না। বানিয়ন-এর পিল্‌গ্রিমস প্রোগ্রেস বইটা সেল্‌ফে আছে দেখলুম। ওটা আমার জানা বই।

শেষপর্যন্ত ওইটেই নেবো ব'লে স্থির করলুম। যখন উপায় নেই তখন মধুর অভাবে গুড় দিয়েই কাজ সারতে হয়।

কিন্তু কী আশ্চর্য ব্যাপার! বইটা শেল্‌ফ থেকে টেনে বের করতেই কোন-এক অদৃশ্য শক্তি উল্টো টান দিয়ে সেটাকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার উপক্রম করলে। টানাটানিতে বইটা ধপ ক'রে মেজের উপর কার্পেটে প'ড়ে গেলো। সঙ্গে-সঙ্গেই চোখ তুলতে দেখলুম, দুটো শেল্‌ফ-এর মাঝখানের একটু ফাঁকে আর-এক ব্যারনেট! তার মুখে কী ক্রূর হাসি! এ কি বাড়ি রে বাবা! কোথাও কি একটুকুও শান্তি নেই? চোদ্দ পুরুষ ব্যারনেটরা সব জায়গাতেই পাহারা দিয়ে বেড়াচ্ছে।

বইটা আমার হাত থেকে কার্পেটে চিৎ হ'য়ে পড়েছিলো। এক জায়গায় পাতা খুলে গেছে। খোলা পাতার দু-দিকেই নানা রকমের দৈত্য-দানোর ছবি এনগ্রেভ করা। সেদিকে দৃষ্টি পড়তেই মনে হ'লো দৈত্য-দানোগুলো মূর্তি ধারণ ক'রে আমায় ঘিরে গিলতে আসছে। ব্যস, আর-কিছু মনে নেই…

জ্ঞান ফিরে আসতে দেখি, আমি উপরের ঘরে নিজের বিছানায় শুয়ে। কোট কলার জুতো খুলে নেওয়া হয়েছে। মুখে বিস্বাদ ব্র্যাণ্ডির জ্বালা। আমার খাট ঘিরে ক্যাপ্‌টেন গ্রীন মিসেস গ্রীন আর এথেল। তাঁদের যেন একটু ভ্যাবাচাকা ভাব। ক্যাপ্‌টেন গ্রীন জিগ্যেস করলেন, 'চ্যাটার্জি, এখন কেমন বোধ হচ্ছে?' কথার ভাবে মনে হ'লো, তিনি যেন কিছু-একটা অনুমান করেছেন, কিন্তু সে-সম্বন্ধে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত দিলেন না। কি জানি কেন, আমি সত্যিই বেশ স্ফূর্তিবোধ করছিলুম। ব্র্যাণ্ডির প্রভাবে কি?

আমি বললুম, 'আপনারা ব্যস্ত হবেন না, আমি বেশ ভালোই বোধ করছি।' গ্রীনরা চ'লে গেলেন।

আমি বুঝলুম, আজ আর ঘুমের চেষ্টা বৃথা। মাথার কাছের সবুজ শেড্ দেওয়া রিডিং ল্যাম্প জ্বালিয়ে বই খুললুম। ক্যাপ্টেন গ্রীন তাঁর ঘর থেকে এনে ওপন্হায়মের লেখা একটা নতুন নভেল টেবিলে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু ওপন্হায়মের নভেলেও বেশিক্ষণ মন বসাতে পারলুম না। সন্ধ্যেবেলার সব ঘটনাগুলো মনের মধ্যে তুলকালাম ক'রে বেড়াতে লাগলো। যদিও হালক্যাশনে সাজানো বেড্ রুমে ইলেক্‌ট্রিক লাইটের নিচে শুয়ে-শুয়ে সমস্ত ব্যাপারটাকে হাস্যকর ব'লেই মনে হ'তে লাগলো, তবু ব্যারনেটের এই চোদ্দ পুরুষের বাড়িতে আর একদিনও কাটাতে ভরসা হ'লো না।

কি ক'রে ভদ্রতা রক্ষা ক'রে গ্রীনদের কাছ থেকে বিদায় নেবো ভাবছি, এমন সময় দরজায় টোকা মেরে প্রবেশ করলেন স্বয়ং ক্যাপ্টেন গ্রীনসাহেব। আমায় জেগে থাকতে দেখে, তিনি একটু মৃদু অনুযোগ করলেন।

আমি আমতা-আমতা ক'রে বললুম, 'লণ্ডনে আমার এক বিশেষ জরুরী কাজ ছেড়ে এসেছি। সেটার কথা বেবাক ভুলে গিয়েছিলুম, হঠাৎ এখুনি মনে পড়লো। আমি ভোরের প্রথম গাড়িতেই লণ্ডনে ফিরে যাবো ভাবছি। মিসেস গ্রীনকে আমার হ'য়ে ক্ষমা প্রার্থনা জানাবেন।'

ক্যাপ্টেন গ্রীন কিছু বললেন না। শুধু তাঁর একটা হাত আমার কাঁধের উপর রাখলেন। ভাবটা, তিনি সবই বুঝে নিয়েছেন। ক্ষমা-প্রার্থনার কোনো দরকার নেই।

খানিকক্ষণ চুপচাপ কেটে গেলো। ক্যাপ্টেন গ্রীন বললেন, 'ভোর পাঁচটাতেই একটা গাড়ি আছে। আমি তোমায় তাতে তুলে দিয়ে আসবো। তুমি মাঝে-মাঝে আমার সঙ্গে হাউস অভ্ কমন্স-এ দেখা কোরো।' ক্যাপ্টেন-এর মুখ বড়োই বিষণ্ণ।

ভোর পাঁচটার গাড়িই ধরলুম। গাড়ি ছাড়বার হুইসল্ পড়তে ক্যাপ্টেন আমার হাত টেনে শেক্হ্যাণ্ড করলেন। স্পর্শে প্রাণভরা স্নেহের আভাস।

ট্যুইক্‌নহ্যাম থেকে ফিরে আসার সাতদিন পরে একদিন সকালবেলায় টাইমস্ কাগজে পড়লুম: গত রাত্রে হাউস অভ্ কমন্স-এ বক্তৃতা দিতে-দিতে ক্যাপ্টেন রবার্ট গ্রীন ভি-সি অজ্ঞান হ'য়ে পড়েন। তিনি এখন চিকিৎসার জন্যে কিং এডওয়ার্ডস হাসপাতালে আছেন। পাঠকদের স্মরণ থাকতে পারে, ক্যাপ্টেন গ্রীন সোম্‌স-এর যুদ্ধে আহত হন এবং তাতেই তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়, ইত্যাদি।

পরদিন হাসপাতালের সুপ্রিন্‌টেনডেণ্ট-এর কাছ থেকে এক চিঠি পেলুম। তিনি লিখেছেন— সুবিধামতো যে-কোনো সময়ে আপনি ক্যাপ্টেন রবার্ট গ্রীন-এর সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করলে তিনি সুখী হবেন।

চিঠি পেয়ে তখুনি গেলুম। এক হাতে কিছু ফুল, আর-এক হাতে কিছু কালো আঙুর। ক্যাপ্টেন-এর ক্যাবিনে ঢুকে দেখি, তিনি মুড়িসুড়ি দিয়ে শুয়ে। এক ফিটফাট ধোপদোরস্ত নার্স একধারে এক চেয়ারে ব'সে কি-একটা বই পড়ছে। আমায় দেখে দাঁড়িয়ে উঠে আমার হাত থেকে ফুল আর আঙুর নামিয়ে নিলো। তারপর চুপিচুপি আমার কানে-কানে বললে, 'ক্যাপ্টেনকে বেশিক্ষণ বকাবেন না যেন। উনি বড়োই দুর্বল হ'য়ে পড়েছেন। আমি অন্য ঘরে যাচ্ছি, ঠিক পনেরো মিনিট পর ফিরে আসবো।'

নার্সের ছেড়ে যাওয়া চেয়ারে ক্যাপ্টেন আমাকে বসতে ইঙ্গিত করলেন। আমি চেয়ারটা তাঁর খাটের কাছে টেনে এনে বসলুম। এই

সাতদিনের মধ্যে ক্যাপ্‌টেন-এর কী চেহারা হয়েছে। অমন সুস্থ-সবল সুশ্রী চেহারার লোকের এই চেহারা! তাঁর মুখের উপর যেন মৃত্যুর পাঁচ আঙুলের ছাপ দেখতে পেলুম।

ক্যাপ্‌টেন গ্রীন অতি ক্ষীণকণ্ঠে বললেন, 'ছ্যাখো চ্যাটার্জি, ডাক্তাররা সবাই ধ'রে নিয়েছেন আমার অসুখটা সেই পুরনো শেল শক-এর দরুন। কিন্তু আমি জানি, আমার অসুখটার সত্যি কারণ কি। কিন্তু সেটা আমি আমার দেশের কোনো ব্যক্তিকেই খুলে বলতে পারছি নে। শুনলেই ওরা হয় হেসে উঠবে, নয় ভাববে, শেল শক-এ আমি পুরোপুরি পাগল হ'য়ে গেছি।'

একটু থেমে, দম নিয়ে ক্যাপ্‌টেন গ্রীন আবার ব'লে চললেন, 'চ্যাটার্জি, তুমি ভারতবর্ষের লোক। তুমি ঠিক বুঝবে। তাই, একমাত্র তোমায় খুলে বলছি। তোমরা এ-সব অনেক দেখেছো, অনেক শুনেছো। তুমি আমার কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবে না, কিংবা আমায় পাগল ভাববে না। শেল শক-টক ও-সব কিছু নয়। আমার এই অসুখ আরম্ভ ট্যুইক্‌নহামের ওই বাড়ি নেওয়ার পর থেকে। ওই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে অন্য কোথাও চ'লে যাবার প্রস্তাব আমার স্ত্রীর কাছে অনেকবার করি। কিন্তু তিনি কিছুতেই রাজী হলেন না। বলেন, যুদ্ধের পর মনোমতো ভালো বাড়ি পাওয়া এক বিষম দায়। ভালো বাড়ি যখন একবার পাওয়া গেছে তখন তিনি ওখান থেকে আর কিছুতেই নড়ছেন না।

'আমি কেন যে ওই বাড়ি ছেড়ে যেতে চাই, তার সঠিক কারণটা অবশ্য তাঁকে খুলে বলতে পারলুম না। কেমন যেন বাধো-বাধো ঠেকলো। এর পর আমি বলেছিলুম, ব্যারনেটদের যতোসব ছবি দেওয়ালে টাঙানো আছে, সে-সব নামিয়ে একত্র ক'রে একটা ওয়্যার-হাউসের গুদোমে রেখে দেওয়া যাক। তাতেও মিসেস গ্রীন-এর আপত্তি। বললেন, ওই

ছবিগুলোই তো বাড়ির বাহার। ছবিগুলো না থাকলে বাড়ি যে একেবারে ন্যাড়া-ন্যাড়া দেখাবে। আমার স্ত্রীর আর মেয়ের কাছে ওই ছবিগুলো ঠিক আর-পাঁচটা ছবির মতো। ওদের যতো উপদ্রব আমার উপর। তোমারও উপর কিছু মন্দ নয় দেখলুম।'

ছবির কথা উঠতেই আমার গা শিউরে উঠলো। ক্যাপ্‌টেন গ্রীন একটু জল খেয়ে নিলেন। তারপর ফের শুরু করলেন, 'ওই ছবিগুলোতে কি জাদু আছে, তা আমি এখনো ঠিক বের ক'রে উঠতে পারি নি। তুমি হয়তো পেরেছো। কিন্তু ছবির ওই মরা ব্যারনেটগুলো আমার কাছে একেবারে জলজ্যান্ত মানুষ। তাঁরা সর্বদাই আমার উপর দৃষ্টি দিয়ে আছেন। যেন নিজেরই বাড়িতে আমি একদল চর পুষে রেখেছি। কী যন্ত্রণা! তাঁরা কখনো বিদ্রূপ করছেন, কখনো রাগ করছেন, কখনো-বা যেন তেড়ে মারতে আসছেন। তোমাকে বলবো কি চ্যাটার্জি, তুমি চ'লে যাবার পর ছ'রাত্তির আমি চোখের দুটো পাতা এক করতে পারি নি। মনে হ'লো ভিতর থেকে যেন সব-কিছু আস্তে-আস্তে ক্ষয়ে-ক্ষয়ে যাচ্ছে। দেখছো তো এই অবস্থা। একটু সেরে উঠলেই কিন্তু সুইৎজারল্যাণ্ডে বেশ দিনকতকের জন্যে স'রে পড়বো—।'

নার্স ফিরে এলো। ঘরে ঢুকেই মুখের উপর আঙুল রেখে দাঁড়ালো। ক্যাপ্‌টেন গ্রীন চুপ ক'রে গেলেন। আমি উঠলুম।

সেরে আর উঠতে হ'লো না। তিনদিন পরে সকালবেলায় টাইম্‌স-এর অবিচ্যুয়ারি কলম্‌-এ পড়লুম: কাল সন্ধ্যা সাতটায় ক্যাপ্‌টেন গ্রীন কিং এডওয়ার্ডস হাসপাতালে মারা গেছেন। আজ বিকেলে কেন্‌সল গ্রীন গোরস্থানে তাঁর সমাধি হবে।

আমার বাড়ির কাছেই জন্ বার্‌কারের মস্ত দোকান। সেখান থেকে

একটা কালো রঙের টাই কিনলুম। কালো ক্রেপের ব্যাণ্ড কিছু টুপির চারধারে জড়িয়ে নিলুম। বাড়ির মোড়ের রাস্তায় ন'নম্বর বাস্ ধরা গেলো। ন'নম্বর বাস্ সোজা কেন্সল রাইস্ পর্যন্ত যায়। সেখান থেকে কবরখানা এক মিনিটের পথ।

আমি যখন কবরখানায় পৌঁছলুম তখন পাদরিসাহেব ক্যাপ্টেন গ্রীন-এর কফিনের সামনে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ছেন— ধুলোমাটির এই নশ্বর দেহ ধরণীর ধুলোমাটিতেই ফিরে যাচ্ছে।

টুপি হাতে নিয়ে মাথা নিচু ক'রে আমি স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলুম।

ডনাল্ড কক্‌সিটর

কক্‌সিটর-পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে মিলবার্নসাহেবের মারফত। ছোট্টো পরিবার। মিস্টার হ্যারল্ড কক্‌সিটর, মিসেস এথেল কক্‌সিটর আর তাঁদের বছর দশেকের একমাত্র সন্তান ডনাল্ড কক্‌সিটর।

মিলবার্নসাহেবকে আমি দেশে থাকতেই চিনতুম। তিনি কর্তার বন্ধু। এককালে বিশপ্‌স কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। এখন স্বদেশে ফিরে এসেছেন। কলকাতায় থাকতে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন।

হ্যারল্ড কক্‌সিটর কি-একটা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে প্রবৃত্ত ছিলেন। আমি বৈজ্ঞানিক নই, সুতরাং ব্যাপারটা যে ঠিক কি, তা আমি নিজেই ভালো বুঝতে পারি নি। অন্যকে কি-আর বোঝাবো? শুনেছিলুম, অপারেশন করার আগে যে-সব বস্তু দিয়ে রোগীকে অজ্ঞান ক'রে নেওয়া হয়, সেগুলো নাকি রোগীর শরীরে অনেকক্ষণ পর্যন্ত একটা গ্লানি রেখে যায়। হ্যারল্ড কক্‌সিটর এমন এক যন্ত্র বের করার তালে আছেন যে, তাতে শুধু হাত লাগালেই মানুষ অজ্ঞান হ'য়ে পড়বে। শরীরে কোনো অসোয়াস্তি বোধ থাকবে না। এই নিয়ে তিনি বিস্তর খাটছেন-খুটছেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত যন্ত্রটা তৈরি ক'রে উঠতে পেরেছিলেন কিনা, সে-খবর আজ পর্যন্ত আমি পাই নি।

মিসেস কক্‌সিটর গৃহস্থালীর অবসরে ছবি আঁকেন। তাঁর আরো-একটি মস্ত কাজ ছিলো। পাড়ায় যতোগুলো হিতকারী প্রতিষ্ঠান ছিলো, তার সব-ক'টার সঙ্গেই মিসেস কক্‌সিটরের প্রাণের যোগ। টাকা তোলার জন্যে কোথাও থিয়েটার-কনসার্ট কোথাও হাতের কাজের সেল্‌ কোথাও

ভ্যারাইটি এণ্টারটেন্‌মেণ্ট— এ-সবে মিসেস কক্‌সিটরের বিষম উৎসাহ। সর্বদাই ও-সবে এগিয়ে যান। এ-সব ব্যাপারে নতুন-নতুন মজা বের করার ফন্দিতেও তাঁর মাথাটা বেশ খোলে। তাই সর্বত্র তাঁর ডাক পড়তো সর্বাগ্রে। মিসেস কক্‌সিটরও কখনো 'না' করতেন না।

ডনাল্‌ড কোন-এক প্রেপ্‌রেটরি স্কুলে পড়তো আর কি ক'রে যে ভদ্রলোকদের অপ্রস্তুতে ফেলা যায়, তারই ফিকিরে ক্রমাগত ঘুরতো। সে মোটেই আমাদের গোপালের মতো শান্ত-শিষ্ট সুবোধ-সুশীল বালক নয়। সাংঘাতিক ছেলে এই ডনাল্‌ড কক্‌সিটর।

মিসেস কক্‌সিটরের সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় শ্যারন্‌স রেস্তোরাঁয়। মিলবার্নসাহেব সেখানে আমাদের সেদিন লাঞ্চে নেমন্তন্ন করেছিলেন। মিস্টার কক্‌সিটর বোধ হয় তাঁর যন্ত্রপাতি নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি আসতে পারেন নি। শ্যারন্‌সে সবই নিরামিষ ব্যাপার। শুনলুম, কক্‌সিটররা ঘোরতর নিরামিষাশী, ডিম পর্যন্ত ছোঁন না। বেশি মাংস খেলে মিলবার্নসাহেবেরও বদহজম হয়। আর আমি ভারতবাসী ব'লে তাঁরা ধ'রেই নিয়েছিলেন, ফলমূলই আমার প্রিয় খাদ্য।

টট্‌নহাম কোর্ট রোড স্টেশনের উল্টো দিকে শ্যারন্‌স। নিচের তলায় ফলফুলের তরিতরকারীর দোকান, ওপর-তলায় ডাইনিং হল্‌। সেখানে টোমাটোর স্যুপ গাজরের কাটলেট আলুর কোপ্তা কড়াইশুঁটির ক্রোকে বাঁধাকপির চাটনি ভাতের পুডিং— এই-সব নিয়ে মেনু। মেনু-অনুযায়ী আ-লা-কার্ত লাঞ্চ হয়তো আমাদের পছন্দ হবে না ভেবে, মিলবার্নসাহেব তিনটে ফ্রুট-লাঞ্চের অর্ডার দিলেন।

লাঞ্চ এলো। একটা কাগজের ট্রের উপর সাজানো আপেল নাসপাতি কলা কমলালেবু আঙুর বিলিতি বৈঁচি আর ফলসা, আর তারই সঙ্গে কিছু বাদাম আখরোট ও মনাক্কা। মুখ-বদলানোর পক্ষে মন্দ জিনিস নয়।

গলা ভিজোবার জন্যে এক-এক গ্লাস ফোর্ট। ফোর্ট যদিও চেহারায় ঠিক ক্ল্যারেটের মতো দেখতে, কিন্তু এতে অ্যাল্‌কহলের নামগন্ধ নেই। নিতান্তই শুদ্ধ নিরামিষ পানীয়— নানারকমের ফল নিঙড়ানো রসমাত্র।

ঘর-ভর্তি লোক। বিলেত দেশেও যে এতোগুলো নিরামিষখেগো লোক আছে, তা এই প্রথম জানলুম। খাওয়া চললো। দেখলুম, মিসেস কক্‌সিটর একবার কথা বলবার সুযোগ পেলে, সে-সুযোগ আর কিছুতেই ছাড়তে চান না। সাহিত্য আর্ট দর্শন নাটক, তিব্বতী লামা থিয়সফি প্ল্যানচেটে ভূত-নামানো কিছুই বাদ গেলো না। সব বিষয়েই তাঁর সমানে অনর্গল বক্তৃতা। বক্তৃতার বহর দেখে মিলবার্নসাহেব আর আমি চুপ। এক-আধটা 'হুঁ' 'না' ক'রেই কাজ সারছি। তার উপর মিসেস কক্‌সিটরের গলাটা একটু চড়ার দিকেই। আমাদের কথা তার তলায় ডুবে যায়।

খাওয়া শেষ হবার পর, বাড়ি ফেরবার সময় মিসেস কক্‌সিটর আমায় জানিয়ে গেলেন, আমি মাঝে-মাঝে সুবিধে মতো ওঁর ওখানে গেলে তিনি খুশিই হবেন। বিদেশি ব'লেই বোধ হয় আমার উপর তাঁর একটু করুণার উদ্রেক হয়েছিলো। ব্যাগের থেকে একটা কার্ড বের ক'রে মিসেস কক্‌সিটর সেটা আমার হাতে দিলেন। দেখলুম, তাঁরা হল্যাণ্ড পার্কে বাস করেন। কোন বাস্‌ কোন ট্রেনে সহজে সেখানে পৌঁছনো যায় তার হদিশ দিয়ে মিসেস কক্‌সিটর আমার নাম ঠিকানা তাঁর নোট বই-এ টুকে নিলেন।

কক্‌সিটরদের ওখানে একদিন যাবো-যাবো করছি এমন সময় মিসেস কক্‌সিটরের কাছ থেকে চিঠি এলো। ডিনারে নেমন্তন্ন। সে-রাত্তিরটা বেশ পরিষ্কার ছিলো। আমি হেঁটেই কক্‌সিটরদের বাড়ি চললুম। অজানা রাস্তা। খুঁজে-পেতে সেখানে পৌঁছতে কিছু দেরি হ'য়ে গেলো। কক্‌সিটরদের

বাড়ির কাছাকাছি গিয়ে দেখি, মিসেস কক্‌সিটর সদর-দরজা খুলে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে এদিক-ওদিক চাইছেন। তাঁর মনে বোধ হয় ভয় ঢুকেছিলো— আমি বিদেশি মানুষ, পথ ভুলে বোধ হয় পথ হাতড়িয়ে বেড়াচ্ছি। কারুর জন্যে এতোটা করা ইংরেজদের স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিন্তু মিসেস কক্‌সিটরের ধরন-ধারন একটু অন্য রকমের।

আমায় আসতে দেখে মিসেস কক্‌সিটর একেবারে রাস্তায় বের হ'য়ে এলেন। আমার হাত ধ'রে বললেন, 'এই যে আমাদের বাড়ি। চলো, ভিতরে চলো।' আমি তাঁর পিছন-পিছন অগ্রসর হলুম। হল্‌-এ মিস্টার কক্‌সিটর দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর পিছনে ডনাল্‌ড। হ্যাট-র‍্যাকে টুপি রেখে এগিয়ে গেলুম। মিসেস কক্‌সিটর তাঁর স্বামী পুত্রের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন। দেখলুম, যেতে-যেতে ডনাল্‌ড আমার আপাদমস্তক বার-বার আড়চোখে লক্ষ্য করতে-করতে চলেছে।

টেবিলে খানা দেবার পূর্বে ড্রয়িং রুমে ব'সে টুকিটাকি গল্প চলছে, এমন সময় ডনাল্‌ড হঠাৎ আমাকে উদ্দেশ ক'রে বললে, 'আপনি তো ভারতবর্ষের লোক মিস্টার চ্যাটার্জি ?'

আমি একটু আশ্চর্য হ'য়েই বললুম, 'হ্যাঁ, আমি ও-দেশেরই লোক বটে। আসলে বাংলা দেশে আমার জন্ম।'

তখন ডনাল্‌ড বললে, 'আমি শুনেছি, ভারতবর্ষের লোকেরা জুতো-মোজা পরেন না, খালি পায়ে হাঁটেন।' ডনাল্‌ডের ভাবখানা দেখে মনে হ'লো, সে যেন ইঙ্গিত করছে, আমি তবে কেন জুতো-মোজা প'রে এসেছি।

আমি বললুম, 'আমাদের দেশে আগে জুতো পরার বড়ো রেওয়াজ ছিলো না। দরকার হ'লে লোকে খড়ম পরতো। এখনো গ্রামাঞ্চলে প্রায় সবাই খালি পায়ে থাকে। শহরেও ঘরের ভিতর অনেকেই শুধু-পায়ে

চলাফেরা করে। আমি নিজে যখন শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের ইস্কুলে পড়তুম তখন সেখানে খালি পায়েই থাকতুম। এখন শহরে থাকি কিনা, তাই জুতো-মোজা পরি।'

আগে অতোটা নজর করি নি, এখন দেখলুম কক্‌সিটররা কেউ-ই মোজা পরেন নি। তাঁদের পায়ের জুতোগুলো ফাঁক-ফাঁক করা স্ট্র্যাপে বাঁধা স্যাণ্ডালের মতো। কথায়-কথায় শুনলুম, তাঁদের ইচ্ছে, ঘরে অন্তত খালি পায়ে থাকেন। কিন্তু ডাক্তারের নিষেধের জন্যে সেটা ক'রে উঠতে সাহস পাচ্ছেন না।

আমার কথা শুনে ডনাল্‌ড জবাব দিলো, 'কোন রবীন্দ্রনাথ? পোয়েট রবীন্দ্রনাথ টেগোর? তিনি তো কালই অ্যামেরিকা থেকে লণ্ডনে এসে পৌঁছেছেন। সেই একই সঙ্গে এলেন, ম্যেরী পিক্‌ফোর্ড। রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্যে একটি লোকও যায় নি, কিন্তু ম্যেরী পিক্‌ফোর্ডকে দেখবার জন্যে শহরের লোক একেবারে ভেঙে পড়েছিলো।'

বড়ো ভয়ানক ছেলে তো এই ডনাল্‌ড। তার দেখছি, চার চোখ চার কান। সে সব দেখে, সব শোনে। সব-কিছুরই খবর রাখে।

মিসেস কক্‌সিটর একটু কটুস্বরে বললেন, 'তা ভেঙে পড়বেই তো। আমাদের দেশে সিনেমা-স্টারদের কাছে কবিদের কী-বা দর? পয়লা-নম্বরের সরেস কবি কবিতা লিখে সারা বছরে যা-না উপার্জন করেন, এক একটা সিনেমা-স্টার একদিনেই তার ঢের বেশি রোজগার করে। সুতরাং—'

মিস্টার কক্‌সিটর এতোক্ষণ একেবারে চুপ ক'রে ছিলেন। এইবার মিসেস কক্‌সিটরের কথা লুফে নিয়ে তিনি বললেন, 'সুতরাং কবিদর্শনের চেয়ে তারকাদর্শনে ঢের বেশি পুণ্য— এই কথাটাই তুমি বলতে চাও নাকি?'

কথাটা বেশিদূর আর এগোলো না। দাসী এসে খবর দিলো, টেবিলে খানা দেওয়া হয়েছে।

আমরা এক-এক ক'রে ডাইনিং রুমে ঢুকলুম। স্যুপ দেওয়া হ'লো। স্যুপের পর যে-জিনিসটা এলো তার চেহারা দেখেই বুঝলুম, কক্‌সিটররা ঘোর নিরামিষাশীই বটেন। জিনিসটা চেখে দেখে বুঝলুম, ওটা আধা কুমড়ো আধা লাউ-এর এক বিচিত্র ঘ্যাঁট-বিশেষ। তারপর এলো এক প্লেট কড়াইশুঁটিসিদ্ধ আর তার সঙ্গে ছোটো-ছোটো কাঁঠালবিচির মতো বিন্‌স-সিদ্ধ মেশানো। খেতে মন্দ নয়। শেষে পুডিং-এর বদলে কলার বড়া, যার ইংরিজি সাধু নাম, বানানা ফ্রিটারস। চীজ্‌ও যে আমিষ, তা এখানে প্রথম শুনলুম। সেটা নাকি শুয়োরের নাড়িভুঁড়ি ছুঁইয়ে জমানো।

ডিনারটা আমার বোধ হয় তেমন পছন্দসই হ'লো না মনে ক'রে, মিসেস কক্‌সিটর নিরামিষ আহারের গুণগান ক'রে মস্ত এক বক্তৃতা ফেঁদে বসলেন। শেষে তার এক আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও বের ক'রে ফেলে কি যে খানিক ব'কে গেলেন, তা আমার ভালো ক'রে বোধগম্য হ'লো না। তবে মজার কথা এই শুনলুম যে, বিলেতেও নাকি হাজার-হাজার নিছক নিরামিষাশী আছেন যাঁরা কখনো মাছ মাংস ডিম ইত্যাদি খান না। এক লণ্ডন শহরেই নাকি পাঁচ-ছ'টা ভেজিটেরিয়ন ক্লাব আছে। সেখানে নিত্য নতুন নিরামিষ রান্নার পরীক্ষা চলছে।

মিসেস কক্‌সিটরকে একটু প্রসন্ন করবার জন্যে আমি বললুম, 'শান্তি-নিকেতন ইস্কুলে আমাদের গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আমাদের জন্যে এক-সময় নিরামিষ খাবারেরই ব্যবস্থা রেখেছিলেন। আমি নিজে একাদিক্রমে পাঁচ বছর পুরোপুরি নিরামিষাশী ছিলুম। ছুটিতে বাড়ি এসেও মাছ-মাংস ছুঁতুম না। কেমন যেন গা ঘিনঘিন করতো।'

মিসেস কক্‌সিটর পরম উৎসাহের সঙ্গে ব'লে উঠলেন, 'আপনাদের

গুরুদেব জ্ঞানী পুরুষ। পৃথিবীতে শরীর সুস্থ রেখে বেশি দিন বাঁচতে গেলে নিরামিষ আহারই একমাত্র উপায়।' উৎসাহের বহর দেখে আমি আর বলতে পারলুম না যে, পৃথিবীতে এমন লোকও অনেক আছেন যাঁরা মাছ মাংস খেয়েও বেশ সুস্থ শরীরে অনেক দিন ধ'রে বেঁচে আছেন।

বেশ চলছিলো, এমন সময় ডনাল্ড-ছোকরা এক অবান্তর ফোড়ন কাটলো, 'আর দেখুন মিস্টার চ্যাটার্জি, টুপি পরাটা বড়ো খারাপ জিনিস। ওতে লোকে অকালপক্ব হয়। চুল তাড়াতাড়ি পাকে, টাকও পড়ে যথা সময়ের অনেক আগেই।'

হ্যারল্ড কক্‌সিটর একবার সেই যে মুখ খুলেছিলেন তারপর এতোক্ষণ একদম চুপ ক'রে ছিলেন। তিনি আর-একবার মুখ খুলে বললেন, 'আমাদের দেশের মেয়েরা দিনমানে হ্যাট পরলেও রাত্তিরে ইভনিং ড্রেসের সঙ্গে টুপি পরেন না। কিন্তু তাঁরা যদি রাতদিন খালি মাথায় থাকতেন, তা হ'লে তাঁদের মাথাটাও বাঁচতো আবার তাঁদের স্বামীদের টাকাটাও সেই সঙ্গে বাঁচতো। আমাদের দেশের স্বামী বেচারীদের পরিবারের হ্যাটের দেনা চোকাতে-চোকাতে প্রায় দেউলে হ'য়ে পড়তে হয়।'

এইরকম নানা রহস্যালাপের মধ্যে খাওয়া শেষ হ'লো। কক্‌সিটররা মদ্যপান করেন না, ধূমপানও করেন না। সুতরাং খাওয়া শেষ হ'তেই সকলে মিলে ড্রয়িং রুমে ফিরে আসা গেলো। মিসেস কক্‌সিটর কোথা থেকে একটা পোর্টফোলিও বের ক'রে এনে হাজির করলেন। তার থেকে বেরুলো তাঁর আঁকা কতকগুলো ওঅটরকলরের ছবি, আর কিছু পেন্সিলে কি ব্রাউন ক্রেয়নে স্কেচ করা কয়েকটি পুরুষ আর মেয়ের মাথা।

ছবিগুলোর আমিই যে প্রথম দর্শক, তা নয়। ছবিগুলোর অবস্থা দেখে মনে হ'লো, যে-কেউ মিসেস কক্‌সিটরের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন, তাঁদের সবাইকেই এইসব ছবি একবার-না-একবার দেখানো হ'য়ে গেছে।

ছবিগুলো বিশেষ-কিছু নয়। তবু মিসেস কক্‌সিটরের আদরের জিনিস ব'লে একটু-আধটু তারিফ করতেই হ'লো। দেখলুম, হ্যারল্‌ড কক্‌সিটর এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন। আমি যতোক্ষণ ছবি দেখছি, তিনি ততোক্ষণ ইভনিং নিউজ খবরের কাগজের পাতা উল্টে চলেছেন। ডনাল্‌ডও তাই। সে দেওয়ালের একটা টিকটিকিকে তাক ক'রে ব'সে আছে।

কথায়-কথায় অনেক রাত্তির হ'য়ে গেলো। ঘড়িতে সাড়ে এগারোটা বাজে। ডনাল্‌ড শুতে চ'লে গেছে। হ্যারল্‌ড কক্‌সিটর মাঝে-মাঝে গোপনে মুখে হাত চাপা দিয়ে হাই তুলছেন। কিন্তু মিসেস কক্‌সিটরের কোনো ক্লান্তি নেই। তিনি সমানে কথা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি উঠি-উঠি করছি দেখে তিনি সস্নেহে জানালেন, লণ্ডনের খুব কাছেই ব্রম্‌লে গ্রামে তাঁদের একটা কটেজ আছে। উইক-এণ্ডে কাজ না থাকলে তাঁরা সেখানেই চ'লে যান। আমি যদি আগামী শনিবার সেখানে ছু-দিনের জন্যে যাই তো তাঁরা খুবই খুশি হবেন। আমিও খুশি হ'য়ে সম্মতি জানিয়ে বিদায় নিলুম।

ড্রয়িং রুম থেকে হল্‌-এ বেরিয়ে এসে দেখি, হ্যাট-র‍্যাকে আমার টুপি নেই। মিস্টার ও মিসেস কক্‌সিটর নির্বিকার। তাঁরা হয়তো ধ'রেই নিয়েছিলেন, তাঁদের মতো আমিও হ্যাট ব্যবহার করি না। স্থতরাং টুপি নিশ্চয়ই সঙ্গে আনি নি। অতো রাত্রে হ্যাট খোঁজার দায়ে ফেলে কক্‌সিটরদের অপ্রস্তুত করার ইচ্ছে হ'লো না। আমি বিনা টুপিতেই বেরিয়ে পড়লুম। ভাগ্যিস সে-রাত্তিরে বৃষ্টিবাদল ছিলো না। ঠাণ্ডাও কম ছিলো, তাই রক্ষে। নইলে, সর্দিকাশির ঠেলায় নিশ্চয়ই বিছানা নিতে হ'তো।

পরদিন সন্ধ্যেবেলায় কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে এসে দেখি, আমাদের ফ্ল্যাটের হল্‌-এর টেবিলের উপর ব্রাউন পেপারে মোড়া এক পার্শেল প'ড়ে

আছে। ফ্ল্যাটের কর্ত্রী মিসেস ফ্লেচর জানালেন, ডিস্‌ট্রিক্‌ট মেসেঞ্জার বয় ওটা দিয়ে গেছে আমারই জন্যে। মোড়ক খুলে দেখি, আমার সেই টুপি যেটা কাল রাত্তিরে কক্‌সিটরদের বাড়ি ছেড়ে এসেছিলুম। টুপির গায়ে আলপিনে আঁটা একটা ছোট্টো কাগজে লেখা— ডোণ্ট ইয়ুজ হ্যাট, অর্থাৎ কদাচ টুপি ব্যবহার করিও না। বুঝলুম, এটা ওই দস্যি ছোঁড়া ডনাল্‌ডেরই কীর্তি।

শনিবার বিকেলে ব্রম্‌লের বাস্‌-এ চ'ড়ে বসলুম। ব্রম্‌লে যাবার ট্রেনও পাওয়া যায়। কিন্তু মিসেস কক্‌সিটর ব'লে দিয়েছিলেন, বাস্‌-এ গেলে বাস্‌স্টপ থেকে তাঁর কটেজ এক লাফেই পৌছনো যাবে। মিসেস কক্‌সিটর কটেজ বলেছিলেন। বাড়ির সামনে উপস্থিত হ'য়ে দেখলুম, কথাটা তিনি নিতান্ত বিনয়বশত বলেন নি। সত্যিই আমাদের দেশের মতোই খোড়ো কুঁড়েঘর। তবে সেটা রাখা হয়েছে যা-হোক তা-হোক ক'রে নয়, অতি যত্ন-সহকারে। ভিতরের সাজসজ্জা আসবাবপত্তর অবশ্য আমাদের দেশের চেয়ে ঢের ভালো। ঢের বেশি সুশ্রী।

এবার আর ভালো টুপি নিই নি। একটা ছিটের পুরনো ক্লথ-ক্যাপ প'রে গিয়েছিলুম। বাস্‌ থেকে নেমেই সেটাকে মাথার থেকে নামিয়ে ওভার-কোটের পকেটে পুরে ফেললুম। যথেষ্ট শীত পড়েছে। কিন্তু উপায় কি? ডনাল্‌ড নামে যে-ছেলেটি ওখানে বিরাজ করছেন, টুপি দেখলেই তো তিনি হন্যে হ'য়ে উঠবেন। ষাঁড়ের মুখে লাল ন্যাকড়া ধ'রে আর লাভ কি?

কটেজের দরজা খুলতেই মিসেস কক্‌সিটর আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা ক'রে ভিতরে ডেকে নিলেন। ডনাল্‌ড এসে শেক্‌হাণ্ড করলে। একবার উঁকি মেরে দেখে নিলো আমার মাথায় কিছু আছে কিনা। তারপর একটু মুচকি হেসে কোথায় স'রে পড়লো। হ্যারল্‌ডসাহেব তাঁর কাজে লেগে আছেন। তিনি সময় ক'রে আসতে পারেন নি।

মিসেস কক্‌সিটর আমার ঘর দেখিয়ে দিলেন। জানিয়ে দিলেন, মফস্বলে তাঁরা সকাল-সকালই খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে ফেলেন। ঘুমুতে যানও শিগ্‌গির ক'রে, আর ওঠেনও খুব ভোর-ভোর। লণ্ডনের জীবনযাত্রার একেবারে বিপরীত।

হাতমুখ ধুয়ে চুল আঁচড়িয়ে স্যুটটা একবার ব্রাশ ক'রে নিয়ে ঘর থেকে বেরুতেই ডনাল্‌ড এসে জানালে, খাবার দেওয়া হয়েছে। মিসেস কক্‌সিটরের লণ্ডনের বাড়ির চেয়ে গ্রামের বাড়ির খাওয়াটা ঢের ভালো দেখলুম। কারণ, এখানে নানা রকমের একরাশ ফল পাওয়া গেলো। সবগুলোই কক্‌সিটরদের বাগানের গাছের। বেশ যত্ন নিয়ে ফলানো, মনে হ'লো। দেখতেও যেমন সুপুষ্ট, খেতেও তেমনি সুস্বাদু। খাওয়াটা জমলো বেশ।

ডিনারের শেষে কফি খেতে-খেতে অনুভবে বুঝলুম, শীত বেড়েই চলেছে, যদিও এটা ঠিক শীতের সময় নয়। কিন্তু মেয়েদের মতো বিলিতি আবহাওয়ার মেজাজ বোঝা ভার। এই বৃষ্টি, এই ঝকঝকে রোদ্দুর। এই পরিষ্কার, এই অন্ধকার। এই শীত, এই গরম। কি যে কখন কি, তার কিছুমাত্র ঠিক নেই। তাই সর্বদাই সতর্ক থাকতে হয়।

মিসেস কক্‌সিটর ডনাল্‌ডকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'তুমি মিস্টার চ্যাটার্জির সঙ্গে একটু গল্প করো। আমি ওঁর শোবার ঘরের ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা ক'রে এখুনি আসছি। রাত্তিরে আরো শীত পড়বে।'

মিসেস কক্‌সিটর উঠে যেতে ডনাল্‌ড অত্যন্ত বিজ্ঞের মতো ব'লে উঠলো, 'শোবার ঘরে আগুন জ্বালানো আমি একেবারেই ভালো ব'লে মনে করি নে। বই-এ পড়েছি, ওতে শরীর খারাপ হয়। আর শুনেছি, শোবার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে অনেকে মারাও গেছে।' খানিক পরে

মিসেস কক্‌সিটর ফিরে এলেন। আমি সকলকে গুড নাইট ক'রে শুতে গেলুম।

নতুন জায়গায় গোড়ায়-গোড়ায় আমার কিছুতেই ঘুম আসে না। তা ছাড়া, বিলিতি বিছানায় শুয়ে মোটেই আরাম পাওয়া যায় না। একটু এপাশ-ওপাশ করার জো নেই। স্থির হ'য়ে একপাশে কুঁকড়িয়ে শুয়ে থাকতে হয়। পাশ ফিরলেই ছ্যাক ক'রে শীত ধরে। চিৎ হ'য়ে অনেকক্ষণ চোখ বুঁজে শুয়ে আছি, এমন সময় খুট ক'রে দরজা খোলার শব্দ হ'লো। আধখানা চোখ খুলে দেখি একটা ছায়ামূর্তি গুটিগুটি এগিয়ে এসে ঘরে ঢুকছে। প্রথমটা ঠিক ধরা গেলো না মূর্তিটা কার। ফায়ারপ্লেসের কাছে আসতে আগুনের আলোতে স্পষ্টই দেখা গেলো, সেটি আর কারুর নয়, স্বয়ং ডনাল্‌ড কক্‌সিটরের।

এতো রাত্রে ডনাল্‌ড কি উদ্দেশে যে আমার শোবার ঘরে প্রবেশ করলো, তা ভেবে পেলুম না। একবার আমার দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে সে দেখে নিলো, আমি মড়ার মতো স্থির হ'য়ে প'ড়ে আছি। তারপর সে ফায়ারপ্লেসের সামনে হাঁটু গেড়ে ব'সে নিবন্ত কয়লাগুলোতে খোঁচা মেরে-মেরে সমস্ত আগুন নিবিয়ে ফেললে। আবার একবার মিটমিট ক'রে আমার দিকে তাকিয়ে পা টিপে-টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

ডনাল্‌ডের নিশ্চয়ই ইচ্ছে ছিলো আমাকে প্রাণে বাঁচানো। কিন্তু তার এই সদিচ্ছার ফলে আমার যে প্রাণ বেরুবার উপক্রম। ঘরের আগুন নিবে যাওয়ার দরুন ঘরটা হ'য়ে উঠলো যেন একটা আস্ত রেফ্রিজিরেটর। দারুণ শীত চামড়া ভেদ ক'রে হাড় পর্যন্ত কন্‌কনিয়ে তুললো। বিছানায় আর শুয়ে থাকা দায়। দু'খানা কম্বল আর সিল্কের আইড়ারডাউনের পাতলা লেপে শানাচ্ছে না। বিছানা ছেড়ে নেমে এসে আবার আণ্ডারওয়্যার স্যুট মোজা ইত্যাদি চড়িয়ে তবে বিছানায় ঢুকতে হ'লো। ওভারকোটটা

বাইরের হল্‌-এ টাঙানো ছিলো, নইলে সেটাকেও গায়ে জড়িয়ে নিতে পারলে আরো ভালো হ'তো। তবে ঘুমের দফা সে-রাত্তিরের মতো একেবারে গয়া।

পরদিন সকালে ব্রেক্‌ফাস্ট টেবিলে আমার চোখ-মুখের অবস্থা দেখে মিসেস কক্‌সিটর জিগ্যেস করলেন, 'কাল রাত্তিরে তোমার বুঝি ভালো ঘুম হয় নি?' তাঁর কথা শেষ হতে-না-হতেই ডনাল্‌ড ব'লে উঠলো, 'হবে কি ক'রে? ঘরের ভিতর নরককুণ্ডুর মতো আগুন জ্বলতে থাকলে কারুর কি ঘুম হয়?' আমি মনে-মনেই বললুম— ওই দারুণ শীতে নরক-কুণ্ডুর মতো না হোক, অন্তত হোমকুণ্ডুর একটু ধিকিধিকি আগুন না জ্বললে ঘুম কারুর আসেই-বা কি ক'রে? ডনাল্‌ডের কথার প্রতিবাদ করতে গেলে কথা বেড়ে যাবে, তাই মুখে আর-কিছু প্রকাশ করলুম না।

ব্রেক্‌ফাস্ট খাওয়া শেষ হবার আগেই ডাক এসে গেলো। রবিবারে শহরে চিঠি বিলি না হ'লেও, মফস্বলে হয়। মিসেস কক্‌সিটর একটা চিঠি প'ড়ে খানিক মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বললেন, 'তুমি কিছু মনে কোরো না মিস্টার চ্যাটার্জি, আমায় লণ্ডনে ফিরে যেতে হচ্ছে। বিশেষ এক জরুরি কাজ প'ড়ে গেছে। ডনাল্‌ড তো রইলো। সে তোমার দেখাশুনো করবে।' ডনাল্‌ড আমার দেখাশুনো করবে? তবেই হয়েছে! ওই ডাকাতে ছেলের হাতে আমায় সমর্পণ ক'রে মিসেস কক্‌সিটর কোথায় চললেন? —এটা অবশ্য আমার স্বগতোক্তি। ভদ্রতার খাতিরে ওটা আর মুখ দিয়ে বেরুলো না।

ডনাল্‌ড মুরুব্বিয়ানার চালে বললো, 'অসুবিধে হবে কেন? আমি থাকতে মিস্টার চ্যাটার্জির কোনোই অসুবিধে হবে না। মিস্টার চ্যাটার্জি তো আর লণ্ডনে কোনো সান্‌ডে-স্কুল দেখেন নি। আজ আমি তাঁকে আমাদের এখানকার সান্‌ডে-স্কুল দেখিয়ে আনবো।' ডনাল্‌ড-এর সঙ্গে

একত্র স্বর্গে যাওয়াটাও বিশেষ নিরাপদ নয়। কিন্তু উপায় কি? মিসেস ককসিটর যে ছেলের কথা শুনে নিশ্চিন্ত হ'য়ে হাসিমুখেই লণ্ডনের বাস্ ধরতে বেরিয়ে পড়লেন।

লাঞ্চ পর্যন্ত কোনো অঘটন ঘটলো না। সারা সকাল ডনাল্ড একটা ভারী কেতাব মুখে নিয়ে একমনে প'ড়ে যেতে লাগলো। আমিও একটা ছবিওয়ালা সান্ডে-পেপারে মনোনিবেশ করলুম। লাঞ্চের পর একটু বিশ্রাম ক'রেই ডনাল্ড আমাকে সান্ডে-স্কুল দেখাতে টেনে নিয়ে চললো।

আধ-মাইলটাক রাস্তা চলবার পর ব্রম্‌লে চার্চটা নজরে পড়লো। চার্চের গায়েই গির্জের অধ্যক্ষ পাদ্রীসাহেবের বাড়ি। বাড়ির একদিকে প্রকাণ্ড একটা টানা হল্-ঘর। শুনলুম, তাতেই সান্ডে-স্কুল বসে। ডনাল্ডকে আসতে দেখে পাদ্রীসাহেব যে খুব খুশি হ'য়ে উঠলেন, তা তো তাঁর মুখ দেখে একেবারেই বোধ হ'লো না। তবে আমায় বিদেশী দেখে তিনি খুব আপ্যায়ন ক'রে ভিতরে নিয়ে গেলেন।

ঘরের মধ্যে সারি-সারি বেঞ্চি পাতা। তার সামনে লম্বা-লম্বা ডেস্কের মতো একটা ক'রে টেবিল। বেঞ্চে ব'সে আছে ডনাল্ডেরই বয়িসী অনেকগুলো ছেলেমেয়ে। রবিবার ব'লে তারা মুখহাত ধুয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হ'য়ে এসেছে। ফিটফাট কাপড়চোপড় পরেছে। পাদ্রীসাহেব তাদের এখুনি সদুপদেশ দেবেন। উপদেশ শোনবার জন্যে তারা বেশ গম্ভীর মুখে যে যার জায়গায় স্থির হ'য়ে ব'সে আছে। ডনাল্ড আর আমি পিছনে সব শেষের বেঞ্চিতে গিয়ে বসলুম।

পাদ্রীসাহেব উপদেশ দিতে উঠলেন। তাঁর সেদিনকার উপদেশের বিষয়, চুরি করা মহাপাপ। তিনি হাত-পা ছুঁড়ে মুখ খিঁচিয়ে চুরি করা কেন যে পাপ সে-সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দিয়ে চললেন। বেশি দূর অগ্রসর হবার আগেই দম নেবার জন্যে একটু থামতে হ'লো। তিনি যেই থেমেছেন,

ওমনি ডনাল্ড সোজা দাঁড়িয়ে উঠে বিনয়গদগদ স্বরে ব'লে উঠলো, 'রেভারেণ্ড সার্, আমায় দয়া ক'রে আপনি মাফ করবেন সার্। আপনার উপদেশ শুনে খালি একটা প্রশ্ন আমার মনে জাগছে। সেটা আপনার কাছে নিবেদন করতে পারি কি সার্ ?'

পাদ্রীসাহেবের মুখ আরো বিকৃত হ'লো। তিনি স্পষ্ট কোনো জবাব না দিয়ে ঘাড়টা একদিকে একটু কাত করলেন। সেটাকে প্রশ্ন করতে অনুমতি পাওয়া গেলো ব'লে ধ'রে নিয়ে, ডনাল্ড গলা উঁচু ক'রে বললো, 'রেভারেণ্ড সার্, আপনি কি সত্যিই বলতে চান যে, আপনি ছেলে-বয়েসে মা-মাসি পিসি-খুড়ি-জেঠি কি দিদিমা-ঠাকুরমা কারুরই ভাঁড়ার থেকে কখনো জ্যাম্ চুরি ক'রে খান নি ?'

প্রশ্ন শুনে ঘরসুদ্ধু লোক হতভম্ব ! পাদ্রীসাহেবের মাথায় চুল খাড়া হ'য়ে দাঁড়ালো। কান দুটো লাল টকটকে হ'য়ে উঠলো। রগের শিরা দুটো দপদপ ক'রে কাঁপতে লাগলো। মুখ-চোখ থেকে এক ঝলক রক্ত ফেটে পড়ে-পড়ে। তাঁর মুঠোসুদ্ধু হাত শূন্যেই মুঠো হ'য়ে ঝুলে রইলো। মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। মনে হ'লো, মনে-মনে তিনি যেন ডনাল্ডের প্রশ্নের এক জবর জবাব খুঁজছেন। কিন্তু উত্তর দেবার আর অবসর হ'লো না। ঘরসুদ্ধু ছেলে-মেয়ে একসঙ্গে হোহো ক'রে হেসে উঠলো। সে-হাসি আর কিছুতেই থামে না। তারা বোধ হয় এতোক্ষণে ডনাল্ডের প্রশ্নের যথার্থ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করলো।

আমি বেশ বুঝলুম, এখানে আর ব'সে থাকাটা কোনোমতেই বুদ্ধির কাজ হবে না— পাদ্রীসাহেবের উপদেশ যতোই শোনবার মতো হোক না কেন। আমার পিছনের দরজা ভেজানো ছিলো। হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে নিঃশব্দে দরজা খুলে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লুম। ঘরের মধ্যে তখনো হাসির হর্‌রা চলেছে। কেউ আমাকে বড়ো লক্ষ্য করলো না।

বাইরে এসে গোড়ায় একবার মনে হয়েছিলো— যাই, কক্‌সিটরদের কটেজে ফিরে গিয়ে আমার উইক-এণ্ড স্যুটকেশটা তুলে নিয়ে আসি। কিন্তু পরমুহূর্তেই মত বদলিয়ে ফেললুম। দ্বিতীয়বার আর ডনাল্‌ডের হাতে পড়বার ইচ্ছে আমার মোটেই ছিলো না। তাই আর সেখানে গেলুম না। সোজা বাস্‌স্ট্যাণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

লণ্ডনের বাস্ তখন ছাড়বার উদ্যোগ করছে। বাস্-এর পথে যতোগুলো জায়গা পড়বে, কনডাক্‌টর একে-একে তাদের নাম হেঁকে জানিয়ে দিচ্ছে। আমি কোনোদিকে না তাকিয়ে, কোনো দ্বিধা-সংকোচ না ক'রে বাস্-এ চ'ড়ে পড়লুম।

দুঃখ হ'তে লাগলো, আমার সাধের স্যুটকেশটা কক্‌সিটরদের ওখানে প'ড়ে রইলো। যাক গে, থাকে থাক। পরে এক-সময় সেটাকে আনিয়ে নিলেই চলবে। এখন তো সটান লণ্ডন শহর।

বাস্ দেখি কিছুতেই যেন ছাড়তে চায় না। কাঁহাতক আর ব'সে-ব'সে প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা যায়। বাস্-কনডাক্‌টরের কাছ থেকে তার ছবিওয়ালা ডেলি মিরর্ কাগজখানা ধার ক'রে এনে তাতেই মনোনিবেশ করবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু পাতা ওলটাতে-ওলটাতে দেখি, কেবলি রাজ্যের খুনখারাপি, মাতলামি, স্ত্রীকে ধ'রে বেদম প্রহার, ভ্রূণ-হত্যা, বিয়ের নাম ক'রে ফুসলিয়ে এনে ব্যভিচার ইত্যাদি যতো সব নোংরা খবরে কাগজটা আগাগোড়া ভর্তি। বিরক্তি ধ'রে গেলো। কাগজটা কনডাক্‌টরকে ফিরিয়ে দিয়ে এসে ফের নিজের সিটে গিয়ে বসলুম।

এতোক্ষণে এইবার বাস্ ছাড়ে-ছাড়ে।

জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি, এক ছোঁড়া প্রাণপণে দৌড়তে-দৌড়তে বাস্‌স্ট্যাণ্ডের দিকে এগিয়ে আসছে। মাঝে-মাঝে এক হাত ঊর্ধ্বে

তুলে বাস্‌কে থামবার ইঙ্গিত করছে। কি হ'লো দেখবার জন্যে যাত্রীরা সবাই সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানলা দিয়ে বাইরে মুখ বাড়ালো।

কাছে আসতে দেখা গেলো, ছোঁড়া অন্য কেউ নন, আমাদেরই ডনাল্‌ড কক্‌সিটর। তার এক হাত খালি, আর-এক হাতে আমার ফেলে আসা সেই উইক-এণ্ড স্যুটকেশ।

তড়াক ক'রে বাস্‌-এ লাফিয়ে প'ড়ে ডনাল্‌ড আমারই পাশে এসে বসলো। তার মুখ দেখে কারুর একটু বোঝবার জো নেই যে, এই খানিকক্ষণ আগে সান্‌ডে-স্কুলে কী কাণ্ডটাই না ঘ'টে গেলো।

হাত থেকে স্যুটকেশটা নামিয়ে রেখে ডনাল্‌ড নির্বিকারভাবে বললো, 'মিস্টার চ্যাটার্জি, যদি কিছু মনে না করেন তা হ'লে দয়া ক'রে লণ্ডনের টিকিট দু-খানাই কাটবেন।'